ডেটিনিউ

প্রকাশক
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

৩য় মুদ্রণ
আশ্বিন—১৩৭২

মূল্য : তিন টাকা

মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

জেল-বন্ধুদের দিলাম—

—শ্রাবণ, ১৩৫৩

গ্রন্থকার পরিচিতি

লেখা লেখকের আত্ম-পরিচয়। ছবি যেমন অবয়বের ছাপ, লেখাও মানসিক চেহারার ছায়া। দেহের অতিরিক্ত মানুষ তাই দেহ ধারণের অতিরিক্ত কর্মে, যেমন—গান, গল্প, চিত্র, কাব্যে, আপনাকে ছড়াইয়া দেয়। শ্রোতা, দর্শক, পাঠক নব নব অনুভূতির স্পন্দন-স্পর্শে নন্দিত হয়। ইহার ধারা আছে, পথ আছে। কোন আগন্তুক স্রষ্টা সে ধারায় বৈচিত্র্য বহন করিয়া আনিলে এবং পথের গতি পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত করিয়া দিলে চমক লাগে, বিস্ময় জাগে। এমনই একজন অকস্মাৎ আসা এবং হঠাৎ হারাইয়া যাওয়া শিল্পীর পরিচয় আলোচনা করিতেছি। তিনি অমলেন্দু দাশগুপ্ত। পূর্ণাঙ্গ পুস্তক তাঁহার মাত্র চারখানা—বক্সাকেম্প, ডেটিনিউ, বন্দীর বন্দনা আর ঋষি রবীন্দ্রনাথ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লেখা আছে আরও। অগ্নিবীণা'র কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের 'বুলবুল'-এর ভূমিকা সম্ভবত তাঁহার প্রথম লেখা। লেখার আলোচনা সুধী পাঠকের দায়িত্ব। মানুষ অমলেন্দু দাশগুপ্তের বাহির ও অভ্যন্তর কি ছিল আর আমরা কি বুঝিয়া ছিলাম তাহার একটা আভাস দিতে পারিলে এ আলোচনা সার্থক মনে করিব।

মাদারীপুরের একটি স্বপ্রতিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত পরিবারে অমলেন্দু জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগৎচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন কন্ট্রাক্‌টার, হিসাবী মানুষ। মাতা জগৎজননীর মানবী মূর্তি—দয়াদাক্ষিণ্যে, স্নেহমমতায়, ভাবভক্তিতে অনন্যা। পিতার প্রাণ মাতৃ ঐশ্বর্যে অলঙ্কৃত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন এক দিন অমলেন্দু। সেদিন মুসলিম দৌরাত্ম্যের আতঙ্কে হিন্দুর আত্মরক্ষার আয়োজন পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে আর, উপরন্তু, বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে তাঁহার জন্ম-মাটি কম্পিত, প্রকম্পিত হইতেছে। অমলেন্দুদের গ্রাম্যভবন খৈয়ারভাঙ্গা এবং মাদারীপুর

সহরের বাসাবাড়ী সামাজিক আর রাজনৈতিক কলরবে তখন মুখরিত। এই আবর্তে নবজাতক চোখ মেলিল, কান পাতিল জীবন চিনিতে।

গৃহের শিক্ষা শেষ করিয়া স্কুলে প্রবেশ করিতেই অমলেন্দু অনুভব করিলেন তাঁহার শ্রেণীর ভাল ছেলেদের মধ্যে তিনি একজন। খেলার মাঠে তাঁহার স্থান নির্দিষ্ট, চলায়-ফেরায়, আচার-আচরণে আভিজাত্য তাঁহার স্বতন্ত্র, তবুও তিনি সাধারণ এবং সকলের প্রিয়। তাঁহাদের যৌথ পরিবারে অনেক ভাই স্কুলের প্রথম হইতে নিম্নতম শ্রেণী পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। উপরের ভাইদের গতিবিধির মধ্যে কেমন একটা রহস্যের সন্ধান পাইয়া তিনি আকৃষ্ট হইলেন, তাহাদের প্রতি যত বেশী, ততই, সে গোপন গুহার দুয়ার দৃঢ় অবরুদ্ধ হইতে লাগিল। একদা প্রভাতে দেখিলেন পুলিসে পুলিসে বাড়ী ভরিয়া আছে। পুলিস সাহেবের পরিচালনায় দারোগার দল তছ্‌নচ্‌ করিতেছে ঘরের দ্রব্য-সম্ভার এবং শেষ অবধি তাহার দুই ভাই নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আর মনোরঞ্জন সেনগুপ্তদের বাঁধিয়া লইয়া গেল তাহারা। দাদারা নাকি ডাকাত! আরও এক বছর পরের কাহিনী—১৯১৫ সনের বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রধান অধিনায়ক যতীন্দ্র-নাথের নেতৃত্বে বালেশ্বরের চষা-খণ্ডে এক অসম যুদ্ধে মাত্র পাঁচজন বাঙ্গালী যুবক কয়েকশত ইংরেজ ও দেশী সিপাই হনন করিয়া পরাজিত হন। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দাদাদের প্রিয় বন্ধু। আর দাদারা? ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হইয়া ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন করেন। সমস্ত পরিবার, পরিজন একটা থমথমে ক্ষোভ ও দুঃখে পাথর হইয়া রহিল।

শৈশব আর কৈশোরের সমস্ত উচ্ছলতা এই দুর্ভার পরিবেশের চাপে পিষ্ট হইতে লাগিল। টুক্‌রা-টুক্‌রা কথা, ছেঁড়া-ছেঁড়া ছবি কানে ও চোখে ঝাপ্‌টা মারিয়া যায়। সামগ্রিক অর্থের সন্ধান ত দেয় না তারা। অমলেন্দু অর্থ খুঁজিতে লাগিলেন। মাতৃপ্রসাদে মন তাহার স্বভাবতই একাগ্র। সেই মনকে পথ দেখায় পিতৃবুদ্ধির

প্রদীপ। সামগ্রিক চিত্র এবং তাহার নতুন অর্থ উদ্ভাসিত হইতে থাকে অমলেন্দুর চিত্তপটে। এটা তার একক অনুভূতি। এই অনুভূতির পিপাসায় তাহার জীবনে নিঃসঙ্গতার আকর্ষণ গভীর হইতে থাকে কোলাহলের মধ্যেও। চতুর্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া অমলেন্দু মাদারীপুর বিপ্লবী দলের প্রত্যক্ষ গণ্ডীর আবেষ্টনীতে জড়াইয়া গেলেন। কতগুলি বাছাই করা বই আর আত্মোৎসর্গী জীবনভঙ্গীর নীতিকথা এ অবস্থার প্রথম পাঠ। সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা', হেমচন্দ্রের 'বাজরে শিঙ্গা', স্বামী বিবেকানন্দের কালীস্তব 'পাশব বল নাশিতে নাচত কালী খড়্গ হস্তা' প্রভৃতি লেখার উপর অমলেন্দুর প্রবল ঝোঁক জন্মিল। দাদাদের আত্মোৎসর্গের নতুন রূপ, নতুন রস তাহাকে পঠনমুখী করিয়া তুলিল। প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে ওঠার মধ্যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর, নবীনচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা তখনও গ্রাম্যসহরে বহুল প্রচারিত ছিল না। তবুও যাহা সম্ভব সংগ্রহ করিয়া প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন। এই লেখার প্রভা ও প্রভাবে আপন জীবনের ছন্দ ও সুর তিনি খুঁজিয়া পাইলেন।

১৯২০ সনের মার্চ মাসে তাহার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার কথা। কিন্তু ১৯১৯ সনের অক্টোবর মাসে শারদীয়া পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার দুই প্রিয় বন্ধুর 'রাস্টিকেট' হইয়া গেল। অপরাধ তাহারা নাকি বিপ্লবী দলের পাণ্ডা। পাণ্ডারা আনন্দে প্রকাশ্য পথেই নামিয়া পড়িল কিন্তু একটা আহত সর্পের জ্বালা কুণ্ডলী পাকাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল অমলেন্দুর হৃদয়-গহ্বরে। ইতিমধ্যে গান্ধীজী ভারতবর্ষের দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া অহিংস অসহযোগের আলোক প্লাবন ছড়াইয়া দিলেন। হিড়িক পড়িল ভাঙ্গার। সম্ভবত, মাদারীপুরের দুইটি 'হাইস্কুল' ইহার প্রথম বলি। 'স্কুল'-এর বারো আনা ছাত্রই দলের ছেলে। ইঙ্গিতমাত্র তাহারা পুঁথিপত্র বগলদাবা করিয়া বিপুল উল্লাসে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে বাহির হইয়া

আসিল পথে। এই অভিযানের পুরবর্তিদের মধ্যে অমলেন্দুকে দেখিয়া সেদিন অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন।

একটা বছর কাটিয়া গেল, ঝড়, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণির বেগে। সমগ্র সমাজ ভাঙিয়া, মুচড়াইয়া যুদ্ধ শেষে তটস্থ হইয়া রহিল। বিপুল জনতা অবরুদ্ধ রহিল কারাভ্যন্তরে। অমলেন্দু মাদারীপুর 'শান্তিসেনা'র বিখ্যাত বরিশাল 'মার্চ' হইতে আরম্ভ করিয়া মাদারীপুর, কলিকাতা এবং বিভিন্ন জিলায় স্বেচ্ছাব্রতী সৈনিক হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের নায়কত্বও করিলেন, কিন্তু নেতার নির্দেশে কারাবরণ করিতে পারিলেন না। দুর্বহ হইল এ সংযম অমলেন্দুর এবং আরও অনেকের। নিয়মানুবর্তিতা এবং কর্তব্য তাঁহারা পালন করিলেন তবুও। এক বৎসরের উন্মত্ত আবেগ স্বাধীনতা আনিল না। যুদ্ধের পুনর্বিন্যাস আবশ্যক হইল। ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইল। অমলেন্দু 'প্রাইভেট' পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এবং 'আই. এ.' পড়িতে গেলেন উৎকট স্বদেশীর আওতার বাহিরে বহরমপুরে। মাদারীপুরের দলাধিপতি পূর্ণচন্দ্র দাস, অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জী, কাজী নজরুল ইসলাম, তাঁহার 'ধূমকেতু'র সহকর্মী প্রভৃতি বন্দীরা ছিলেন ঐ কারাগৃহে অবরুদ্ধ। অমলেন্দু হইলেন তাঁহাদের গোপন ডাকঘর। বাহির হইতে বন্দীদের জন্য আসা এবং বন্দীদের নিকট হইতে বাহিরের গন্তব্য স্থানে যাওয়ার পত্র অমলেন্দুর মাধ্যমে বিলি হইত। পুলিশের চক্ষে শনির চাহনী। তাহারা একদিন হাতেনাতে ধরিয়া ফেলিল অমলেন্দু আর তার দুই বন্ধু কালীপদ রায়চৌধুরী ও প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়কে। সুতরাং তাঁহারা গেলেন জেলে। জেলে অমলেন্দু ও প্রফুল্লর এই প্রথম পদার্পণ।

জেলযাত্রার কিছু গৌরব এবং কারাগারের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্বল করিয়া অমলেন্দু ফিরিয়া আসিলেন ঢাকা। জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হইলেন। উদ্দেশ্য পড়াশোনা, অন্তত পাশ করা। ঢাকা সহর পূর্ববঙ্গ বিপ্লব আন্দোলনের সূতিকাগার। ঢাকা অনুশীলন

সমিতি, শ্রীসঙ্ঘ, যুগান্তরের বিভিন্ন শাখা ও মাদারীপুর দল সক্রিয় ছিল ঐ সহরের অলিগলি ব্যাপিয়া। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠির সঙ্গে অমলেন্দুর হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিল। ইতিমধ্যে ১৯২৩-২৪ সনে সকল বিপ্লবী দলের উপর ধাপের কর্মী ও নেতৃবৃন্দ বন্দী ও অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে বিভিন্ন জেলে। দল গঠনের এই অবকাশে অমলেন্দু 'আই. এ.' পাশ করিয়া 'বি. এ.' ক্লাশে ভর্তি হইলেন। দক্ষিণ কলিকাতায় তখন মাদারীপুর দলের শাখা সম্প্রসারিত হইয়াছে। ললিতমোহন সেন, চিত্তরঞ্জন বসু, জনার্দন চক্রবর্তী প্রভৃতি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে ডাক পড়িল অমলেন্দুর। বিদ্যাপীঠ হইতে অতএব তাঁহাকে বিদায় লইতে হইল। 'কর্পোরেশন স্কুলে' দুপুরে চাকুরী আর বাকি দিন রাজনীতির ময়দান চষিয়া বেড়ান হইল কাজ। ১৯২৮ সনের কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশন পর্যন্ত ইহাই ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম।

১৯২৯ সনে বাংলার বিপ্লবী দলগুলির একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। দলাধিপতিগণ মত পরিবর্তন করিয়াছেন সুতরাং পথও, —এটা অধস্তনের নালিশ। যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিবেচনার ঝড় উঠিল। মাদারীপুর দল ইহাতে অগ্রণী। এই আলোচনার আসরে অমলেন্দুর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ এবং তীব্র সমালোচনা প্রতিপক্ষকে কেবল অভিভূতই নয়, পরাজিত করিল। বুদ্ধি বা বিশ্লেষণের পরাজয়ে নেতৃত্বের পরিবর্তন কোন বিপ্লবী দলেই সম্ভব নয়। নেতৃত্বের অপসারণ অথবা দল ভাঙ্গাই স্বাভাবিক পরিণতি। অথচ অমলেন্দু সায় দিতে না পারিলেন নেতার অপসারণে, না দল ভাঙ্গায়। তৃতীয় কোন মীমাংসাও তখন জানা ছিল না। শেষ চেষ্টা হিসাবে পুরাতন এবং নূতন নেতৃত্বের শীর্ষস্থানীয়দের একটি সভা হইল। দক্ষযজ্ঞ না হইলেও তাহার পূর্ণ ফলই পাওয়া গেল। অমলেন্দু সবই দেখিলেন, সবই শুনিলেন, বলিলেন না কিছুই। নির্বিচারে নতুন নেতৃত্ব মানিয়া লইলেন। একটা নতুন মাদকতা, অসাধ্য উদ্যম, বেহিসাবী আত্ম-

আহ্নতির বেগ লইয়া বিপ্লবের নতুন অভিযাত্রী দল মৃত্যুর পথে বাহির হইয়া পাড়লেন। ইহাদের জন্যই পুলিশ নতুন নামাকরণ করিল এন. ভি. পি.--New Violence Party অথবা এ. ভি. পি. Advance Violence Party। ১৯৩০ সনের বিপ্লবী আন্দোলন—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৬ সনের শেষ অবধি ইহারা আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অমলেন্দু অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অব্যবহিত পরেই ধৃত হন। তাহার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে তিনি 'প্রাইভেট বি.এ.' পরীক্ষা দেন। জেলে বসিয়া ফলশ্রুতি হইল, তিনি পাশ করিয়াছেন। ১৯২৯ সনে তিনি বিবাহ করেন পারিবারিক ইচ্ছার তাগিদে। সংসারের দায়হীন অনাসক্ত মানুষের কর্তব্যবুদ্ধি যেন ঠেলিয়া তাহাকে দাম্পত্য বন্ধনে জড়াইয়া দিল। স্ত্রী শ্রীমতী মুরলা দেবী আত্মনির্ভরতা, সুগৃহিণীপনা এবং স্বামীর দায়দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সাধ্যের অতিরিক্ত তাহা পালন দ্বারা স্বামীর জন্য একটি সংসারী পরিবেশ রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এটা ছিল অমলেন্দুর সৌভাগ্যের দান।

'৩০ সনের বিপ্লবী আন্দোলনে ধরা পড়িয়া ফরিদপুর জেল, সিউড়ী জেল, বক্সাদুর্গ, দেউলী 'ডিটেনসন ক্যাম্প' ও প্রেসিডেন্সী জেলে প্রায় আট বৎসর কাটাইয়া তিনি মুক্তি পান। দেউলী ক্যাম্পে থাকিতেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মুক্তির পর কিছুকাল কর্পোরেশনে চাকুরী করেন। ১৯৪০ সনে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র প্রবর্তিত 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণের আন্দোলনে নেতার অবর্তমানে পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন হাওড়ার °হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তর কলিকাতার শ্রীহেমন্তকুমার বসু এবং মাদারীপুর দলের পক্ষে শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী (প্রাক্তন মেয়র) ও অমলেন্দু দাশগুপ্ত। এই আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে হরেন ঘোষ, সুধীর রায়চৌধুরী ও অমলেন্দু দাশগুপ্ত কারারুদ্ধ হন। প্রেসিডেন্সী জেলে চার-পাঁচ বৎসর কাটাইয়া ১৯৪৬ সনে মুক্তি পান। কারারুদ্ধ হওয়ার পূর্বে কিছুদিন মৌলবী ফজলল হকের (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) দৈনিক সংবাদ-

পত্র 'নবযুগে' কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেল হইতে মুক্তি পাওয়ার পর আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সহিত যুক্ত হন। মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫৫ সনের ১১ই আগস্ট মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

এটা বাহিরের কর্মজীবন। আটপৌরে মানুষ অমলেন্দুর ইতিবৃত্ত। তবুও অভ্যন্তরের উপর ইহার প্রভাব আছে। এই কর্মজীবনের জানালা দিয়া অবলোকন করিলে যে চরিত্র দেখা যায় তাহা এক অচল-চিত্ত অতি-পুরুষের প্রতিকৃতি। সংসারের প্রবল আবর্ত তাহাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া ঘাটে অঘাটে ঘর্ষণ করিয়া চলিয়াছে, প্রকৃতির ক্ষমা নাই আর অচলায়তনের ক্ষোভ নাই, ক্ষতি নাই। অদ্বৈত দর্শনের দ্রষ্টা দেখিয়াই খুশী। ১৯৩৬ সালে কাজী নজরুল ইসলামের হরি ঘোষ স্ট্রীটের বাসভবনে অমলেন্দু সাক্ষাৎ পান এক মহাযোগীর। তিনি লালগোলার বরদা মজুমদার। তাঁহার প্রসন্ন স্নেহ বর্ষিত হয় অমলেন্দুর অন্তর প্লাবিত করিয়া। যোগাভ্যাসের ফল স্বরূপ নয়, তাঁহার জন্মার্জিত প্রস্তুতির স্বীকৃতি লাভ এই আশীর্বাদ।

তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি। বিচার বিশ্লেষণ চমৎকার। সিদ্ধান্ত অকাট্য। তবুও অমলেন্দুর অন্তর তাহাতে সম্মতি দেয় না। বুদ্ধির অতীত কোন এক ভূমি আছে যেখানে বসিয়া বুদ্ধি ব্যবহার করা চলে, কিন্তু বুদ্ধিকে মানা চলে না, এমনই এক স্থানের তিনি ছিলেন স্থায়ী অধিবাসী। বুদ্ধি এবং অবুদ্ধির অপূর্ব সমন্বয় তাই, তাঁহার কাছেই ছিল সম্ভব। বৈদান্তিক দর্শনের এই সুর তাঁহার জীবনের এক-তারায় ছিল অশ্রান্ত। সুর থাকিলেই তাহার ব্যাপ্তি আছে, ব্যাপ্তির পরিসর আছে আর আছে তার শ্রোতাও। সুতরাং বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈত, দ্বৈত এমনকি বিশিষ্টাদ্বৈত পর্যন্ত ঠেকানর উপায় নাই। যুক্তি তর্কের কথা নয়, রূপ রসের সমাবেশ আপনি আসিয়া যায়। কৈশোরের মুগ্ধ আকর্ষণে অমলেন্দু রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তার ভিত্তি ছিল বিস্ময়, যৌবনে ও প্রৌঢ়ে তাহাই 'রূপং রূপং বহু

রূপং বভূব' হইয়া চোখের পাতা ভরিয়া তুলিল; 'রসোবৈসঃ' প্রাণের-পাত্রে দিল তৃপ্তির পসরা পূর্ণ করিয়া।

এটা অভ্যন্তরের সত্ত্বা। ইহার না আছে নাম, না আছে রূপ। কিন্তু ইহাই ত নাম ও রূপের কঠিন বেষ্টনীতে দৃঢ় আবদ্ধ হইয়া মূর্ত হয়। অমলেন্দুর কেবল নাম, রূপই ছিল না, ছিল তার আভিজাত্য এবং প্রভাবও। বংশ এবং মাতৃপ্রভাবে ধর্ম; সামাজিক, রাজনৈতিক বিশেষ করিয়া বিপ্লবী আন্দোলনে দাদাদের মৃত্যু দেশ ও জাতি সম্বন্ধে তাহাকে অতি সচেতন করিয়া তুলিল। বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, নির্ভীকতার প্রতি সমাদর, নির্জিতের প্রতি সহানুভূতি সাধারণ মানবিকতা। কিন্তু ধর্ম, দেশ ও জাতিকে আপন সত্ত্বায় ধারণ ও বহন করা অসাধারণ কীর্তি। জীবনের কর্মে রূপায়িত হোক আর নাই হোক, প্রতি সচেতন মুহূর্তে অমলেন্দু জানিতেন তিনি ধর্ম, দেশ ও জাতির প্রতিনিধি।।

অমলেন্দু স্রষ্টা ছিলেন না। যে অর্থে 'সাহিত্যিক' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত তিনি তাহাও ছিলেন না। বস্তুত, তিনি ছিলেন ভোক্তা। পড়িয়াছেন অনেক, ভাবিয়াছেন তাহারও অধিক, রসাস্বাদন করিয়াছেন কত তাহা কে বলিবে। নজরুলের 'অগ্নিবীণা' রক্তে সর্বনাশের নেশা লাগাইয়াছে, সর্বনাশের পথে জানিয়া শুনিয়াই তিনি পা বাড়াইয়াছেন। কিন্তু, 'বুলবুল'? 'বুলবুল'-এর গজল তাহাকে চন্দ্রালোকে নাচাইয়া ছাড়িয়াছে। তাহার হৃদয়-যমুনা গলিয়া ঢলিয়া তীর ভাসাইয়া দিয়াছে। গোপন অনভূতি ধরিয়া রাখার সাধ্য ছিল না। তাহা ব্যক্ত করিলেন ভাষায়। লেখার গরজে লেখা নয়, ইহা আকস্মিক আবেগের মুক্তি। এমন লেখা আরও আছে ইতস্তত ছড়ান। নিজের চাইতে বরং পরের গরজের লেখার সংখ্যাই অধিক। বক্সাদুর্গে রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তীর অভিনন্দন অমলেন্দুর লেখা। কবি সম্রাটের চিত্তে দোলা লাগাইয়াছে সে লেখা। অথচ, ইহা উপরোধের লেখা। বক্সাকেম্প, ডেটিনিউ এবং বন্দীর বন্দনা সম্বন্ধেও এ কথা অনেক অংশে সত্য।

সাহিত্যিকের লেখার একটা নিজস্ব গরজ আছে। সব না হইলেও পারিপার্শ্বিক তাহার প্রধান উপাদান। আবার ইহার একটা সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যও থাকে। বিভিন্ন রসের সমাবেশ এবং তাহার সংঘাতজনিত প্রবাহ লেখাকে কোন এক তৃপ্তির সীমান্তে পোঁছাইয়া দেয়। কিন্তু, অমলেন্দুর লেখার ধরন আলাদা। রসভোক্তার রসাস্বাদন এক অনুভূতি। তাহাই অপরের ঠোঁটে মাখাইয়া দিলে সেই অপরের অনুভূতিটুকু উপভোগ, এও এক আস্বাদন। ইহা পরোক্ষ আস্বাদন বা রসোৎসব। অমলেন্দুর লেখার ইহাই রহস্য। বক্সাকেম্প, ডোটিনিউ কিংবা বন্দীর বন্দনায় কতগুলি চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। অমলেন্দু জানেন, বিপ্লবীগণও জানেন যে চরিত্রগুলির প্রতিটি সত্ত্বা এক একটি আগ্নেয়গিরি। অভ্যন্তরে তাঁদের গলিত লাভাস্রোত গর্জমান। যে কোন ক্ষণে বহির উদ্গীরণ সম্ভব। বিরাট ধ্বংসের আগুন বুকে লুকাইয়া তাঁহারা সন্তর্পণে সমাজের মধ্য দিয়া বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা মহৎ মৃত্যু, তাঁহারা মহৎ মুক্তি, তাঁহারা সৃষ্টির নমস্য। সেই চরিত্রগুলির মধ্যেও যে রসধারার গুপ্তফল্গু নিরন্তর প্রবহমান ইহা ত অমলেন্দুই দেখিয়াছেন এবং আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্র-নাথ রুদ্রকে আহবান করিয়াছেন দুঃখদৈন্য নাশ করিতে প্রয়োজনের তাগিদে। রুদ্রকেও সুন্দর দেখিয়াছেন কি না আমার জানা নাই। কিন্তু অমলেন্দু রুদ্রকে কেবল সুন্দরই দেখেন নাই, রসমহোৎসবে রসস্নাত রসযাত্রী রূপেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই ত তাঁহার লেখায় বিপ্লবী চরিত্রগুলির এক অপূর্ব রূপায়ণ সম্ভব হইয়াছে। কেবল অমলেন্দুকে দিয়াই এ লেখা সম্ভব। বড় বড় চোখের বিলোল চাহনীতেই এ ছবি ধরা দেয়।

লেখা বরং কিছু দীর্ঘায়ু। অমলেন্দুর বইগুলি পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। ইহার মধ্য দিয়া আমরা লেখককে নিশ্চয় চিনিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু, সান্নিধ্য স্বল্পস্থায়ী। যাহারা অমলেন্দুর কাছের সাথী তাহারা লেখার চাইতে মানুষটিকেই অধিক পছন্দ করিতেন। আলাপে আলোচনায় আচরণে সর্বক্ষণ পাশে থাকিয়া তাহার রসিক মনের

ছোঁয়াচ সকলকে আপ্যায়ন করিত। একটু বক্র চাহনী মেলিলে তাহার মধ্যেই একটা নিরালা একাকীত্বও নিরন্তর প্রহরারত অনুভব করা যাইত। যেন একটা দ্বৈত ভূমিকায় অবিভক্ত এক অভিনেতা। তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের আকর্ষণ হিমালয়। কেমন করিয়া ধারণাটা তাহার চেতনায় গাঁথিয়া গিয়াছে যে অনাদি প্রাণের জন্ম ও জীবন মানস-সরোবরের অফুরন্ত কামনাস্রোতে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলেতায় বিকশিত হইতেছে, আবার স্থূল হইতে সূক্ষ্মতায় বিবর্তনের মন্ত্র ঐ হিমালয় বিগলিত সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের ত্রিধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। সিন্ধু ফুরাইয়া গিয়াছে তাহার সভ্যতা ও সংস্কার লইয়া; একক গঙ্গা তাহার পরবর্তী অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া অবরুদ্ধা। ব্রহ্মপুত্র আজও আবৃত। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মিলন-তীর্থ এই বাংলা। সুতরাং মানব-মুক্তির মহামন্ত্র এই বাংলায়ই উদ্গীত হইবে। আজকের নয়, ভাবী বাংলার প্রতি অংগুলী নির্দেশ করিয়া এ কথা তিনি লেখার মাধ্যমে উচ্চারণ করিয়াছেন। যুক্তির কথা নয় কারণ যুক্তি বুদ্ধির নির্ধারণ মাত্র এবং সংশয়ের হেতু। ইহা তাঁহার বিশ্বাস। বিশ্বাস সংশয় বিরহিত আত্মার নির্ণয়।

আরও একটি লেখার ধারায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া উচিত। 'শ্রীঅরবিন্দ কি ব্রহ্মজ্ঞ?' প্রশ্ন উত্থাপন, তাহার বিশ্লেষণ এবং তুলনায় রবীন্দ্রনাথকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া স্বীকৃতি দান কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। অমলেন্দু কেবল নিজের ভাবাবেগের কথাই বলেন নাই, পণ্ডীচারীর প্রতিবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহা আমাদের মীমাংসার বিষয় নয়। বরং আমাদের আয়ত্তের বাহিরের বস্তু। আমাদের দৃষ্টি অমলেন্দুর প্রতি নিবদ্ধ। কি সাহসে তিনি ব্রহ্মজ্ঞের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন! অমলেন্দু জানিতেন—যাজ্ঞবল্ক গাগীকে বলিয়াছিলেন 'গাগী আর প্রশ্ন করিও না, করিলে এখনই স্কন্ধ হইতে তোমার মস্তক ভূতলে লুটাইয়া পড়িবে।' অমলেন্দুরও স্কন্ধে একটি মস্তক ছিল, পদতলে ভূতল ছিল, ভূতলে মস্তক লুণ্ঠিত হইতেও পারিত। কিন্তু, তবুও

যে প্রত্যয় তাঁহাকে প্রশ্নে প্রবর্তিত করিয়াছে তাহা কি অজ্ঞতা! ইহার সদুত্তর আমাদের হাতে নাই। একটা আন্দাজ করিতে পারি—ব্রহ্মোপলব্ধির স্বাদ অমলেন্দু পাইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মীস্থিতি আর ব্রহ্মোপলব্ধি পৃথক ব্যাপার। অমলেন্দুকে চেনার জন্য এ তথ্যও মূল্যবান।

ধর্মগ্রন্থ হইতে ধার্মিকের সান্নিধ্য অধিক কাম্য তেমনই লেখার চাইতে লেখকের নৈকট্য অধিক বরণীয়। বিশেষত, লেখাই যাহার জীবনী তেমন লেখক ত সাধক। বহু লেখা, বিচিত্র লেখা তাহাদের অসাধ্য, অধর্মও। তেমন লেখকের সাহচর্য জীবনে আশীর্বাদ। সেই লেখকের সাক্ষাৎ যখন অসম্ভব তখন তাহার লেখার মধ্য হইতেই তাহাকে মূর্ত করিয়া তুলিতে হইবে। অমলেন্দু অল্পই লিখিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন তাহা একত্র গ্রথিত হইলে লেখকের একটা ছবি উদ্ভাসিত হইতে পারে। আশা করিতে দোষ নাই যে কোন গুণগ্রাহী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ চেষ্টা করিবেন।

আমরা অমলেন্দুকে দেশভক্ত কর্মী বলিয়া জানিয়াছি: সংশয় ও শঙ্কার মধ্যে সর্বগ্রাহ্য সমাধানে পটু বুদ্ধিমান বলিয়া জানিয়াছি; সূক্ষ্মরস স্রষ্টা সাহিত্যিক, উচ্চ পর্যায়ের দার্শনিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছি; হৃদয়বান এবং নির্ভরশীল বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার লেখার মধ্যে এ সকল গুণের পরিচয় সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ়। তবুও কি সাহস করিয়া বলিতে পারি অমলেন্দু কি ছিলেন! তাঁহাকে ছুঁইয়া কবুল করার দায়িত্ব সেই হেতু, পাঠকবর্গের উপর ন্যস্ত করিতে পুস্তকখানিই আগাইয়া দেওয়া হইল। বিভিন্ন প্রাণে বিভিন্ন ছায়া পড়িলেও সকল ছবিই যে অমলেন্দুর তাহা নির্ভয়ে আমরা স্বীকার করিব। কবি বলিয়াছেন—নব নব রূপে এস প্রাণে—।

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী

মুখবন্ধ

শিশু সাহিত্য সংসদ আজ আর শুধু শিশু সাহিত্য প্রকাশেই তাঁদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। যাকে বলে ক্লাসিক্যাল সাহিত্য বাংলার সেই শ্রেণীর গ্রন্থও যাতে বিলুপ্ত হয়ে না যায় সেদিকেও বেশ কয়েক বছর যাবৎ মন দিয়েছেন, সেই পর্যায়ের আর একখানি গ্রন্থ অমলেন্দু দাশগুপ্তের 'ডেটিনিউ'। একেও বিস্মৃতির পথ থেকে উদ্ধারের কাজে সংসদ হাত দিয়েছেন, এ-সংবাদ শুধু আনন্দের নয়, আজকের বাংলায় আশার কথাও। কেন, সেই কথা বলবার জন্যেই এই মুখবন্ধ লিখতে বসেছি।

আজ কিছু কাল যাবৎ দেখছি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসকে বেশ এক সরল পদার্থে পরিণত করে তোলা হয়েছে। আমরা যেন ভুলে গেছি, ভারতবর্ষের ইতিহাসও কোনো এঞ্জিনিয়ারের পরিকল্পিত হাতেকাটা খালের মতো একটি সরল ধারায় বয়ে আসে নাই, তার পরাধীনতাও কোনো ঋজু পথ অনুসরণ করে নাই, তেমনি তার স্বাধীনতা বা স্বরাজ যদি এসে থাকে তবে তা-ও এক স্বয়ম্ভূ আন্দোলনের দান নয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের হিসাবে মহাত্মা গান্ধী একদিন দৈবক্রমে আবির্ভূত হলেন; সহস্র বৎসরের নিদ্রিত জাতিকে ডাক দিলেন, সে জেগে উঠলো; ২৭ বছর লড়লো আর স্বরাজ এসে গেল। এমন কোনো সহজ ঘটনা ঘটে নাই। ইতিহাসের এই যে বিশ্লেষণ, এর অগভীর জলের নীচের পাঁকে ডুবে গেছেন তাঁরা, যাঁরা আক্ষরিক সত্যে নিজেদের জীবন-মরণ পণ করে আহ্বান জানিয়েছিলেন জাতির সেই জাগ্রত চেতনাকে, যাকে সম্বল করেই মাত্র গান্ধীজি নামতে পেরেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে। এঁরা বাংলার, তথা ভারতের বিপ্লবী সমাজ। বহু বিস্মৃত শতাব্দীর নিদ্রিত জাতির ভিতর জন্ম নিয়েছিলেন একদল আপনভোলা,

নিবেদিতপ্রাণ, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় যুবক, যাঁদের পণ ছিল : আমরা মরব, জাত জাগবে। তাঁদেরই কিছু লোকের সাধনায় আর মৃত্যুতে সেদিন ভারতের পূর্ব গগনে দীর্ঘ অমানিশার শেষে নবজাগরণের উদয়-ঊষার ছটা দেখা দিয়েছিল, সেই আলোতেই শুধু আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল গান্ধীজির। অমলেন্দুর ডেটিনিউ সেই বিপ্লবী সমাজের কথা বলেছে। তাঁদের ইতিহাস এ গ্রন্থ নয়, তাঁদের জীবন-বৃত্তান্তও নয়, তাঁদের চরিত্রের বিস্মৃত অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকের এ এক অনাবিল বিস্ময়কর প্রতিচ্ছবি। এ আলেখ্যের ধ্যানে আজকের বাংলার যুবক গড্ডলিকার বাইরে আরও যে কিছু থাকতে পারে, হয়তো তার সন্ধান পাবে।

হেতুবিচার চেষ্টা অনেক জিনিসেরই এখানে সম্ভব নয়, কিন্তু এটা জানা কথা যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ বলে যা পরিচিত ছিল বহু যুগ ধরে তার অন্তত শিক্ষকশ্রেণীর লোকের ঐকান্তিক সাধনার বস্তু ছিল আত্মোপলব্ধি, আত্মজ্ঞান, আত্মচিন্তা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর মর্মকথা বিশ্বাত্মজ্ঞান, অন্তত বিশ্বমানবের সংগে একপ্রাণতা। এর বাস্তব প্রয়োগে বিরাট শক্তির স্ফুরণ সম্ভব। সেই শক্তিতে ভারতবর্ষ এককালে শক্তিমান, ঐশ্বর্যবান, কোনো কোনো দিকে সে যুগের পক্ষে বিশ্বের ইতিহাসে অপরিমেয় জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল। এ ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে অনন্যভাবে সূক্ষ্ম আমি নিয়ে একটা জাতির নেতৃস্থানীয়দের জীবনযাত্রার অবশ্যম্ভাবী ফল কালক্রমে ফলেছিল। তার স্থূলে আমির দিকটার বিকাশ ও পরিণতি অন্তত বহুক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে অবহেলার বস্তু হয়ে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। এই মানসিকতার অন্যতম ফল, এখানে নেশন স্টেট গড়ে ওঠা বিলম্বিত হয়েছে। এর অর্থনৈতিক এবং অন্যবিধ কারণও ছিল। কিন্তু সব দিকের বিচারের এখানে অবকাশ নেই। বার বার ভারতীয় জাতির এ দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু সত্য অর্থে নেশন স্টেট আজও পুরো গড়ে উঠেছে --একথা বলা কতকটা দুঃসাহসের কাজ।

ইতিহাসের অগ্রগতির পথে এই যে আমাদের গতি-প্রকৃতি, তার ফল ক্রমে যা দাঁড়ায় তা কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়। সূক্ষ্ম আমি নিয়ে যে একান্ত আধ্যাত্মিক জীবন, বাস্তব দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগের অবকাশ প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হওয়া চাই; না হলে রক্তমাংসের মানুষের স্নায়ু দীর্ঘকাল তার চাপ সইতে পারে না। ভারত যে তা পারে নাই তা স্পষ্ট। এতে বিস্ময়ের বা অবজ্ঞার কিছু নেই। বিস্ময়ের এবং অবজ্ঞার কথা ঘরে বাইরে আমরা শুনি। তার কারণ, ভারতের ইতিহাসের প্রাচীনত্ব আর তার জটিল এবং বিচিত্র চরিত্র অন্য অনেক জাতির সঙ্গে তুলনায় দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়। সূক্ষ্ম আমির সাধনার যে-পরিণতির কথা বলেছি, ক্রমে হয়তো তা স্বাভাবিক কারণেই দেখা দিল স্থূল আমির ক্ষেত্রেও। তার বিশ্বাত্ম-বোধসত্ত্বেও আত্মোপলব্ধির, আত্মজ্ঞানের, আত্মচিন্তার সাধনা একান্ত-ভাবে নিজেকে নিয়েই ব্যাপৃত। স্থূল আমির সাধনায় নেমে এসেও তার দৃষ্টি তেমনি নিজেকে কেন্দ্র করেই সব-কিছু দেখতে রইলো। ফলে, সমাজবন্ধনে ঐক্যের চেয়ে বিচ্ছিন্নতাই তার কাছে প্রবলতর বাস্তব হয়ে পড়লো। মনের অগোচরেও সে জানলো--আমি আগে, সমাজ পরে। দুনিয়ার অন্যত্র যখন কয়েক শতাব্দী ধরে জাতীয়তাবোধ ফুটে উঠতে রইলো, আমরা আধুনিক জগতেব ঐ সম্পদে, ঐ শক্তিতে বঞ্চিত হয়ে রইলাম। তারপর, বৃহত্তর মানবসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ যখন বাড়লো, তখন দেখা গেল, আঘাতসংঘাতের সামনে দাঁড়াবার পক্ষে স্বভাবতঃই আমাদের যোগ্যতা কম।

ইতিমধ্যে, এদেশের ভৌগোলিক ও কৃষ্টির সীমার বাইরে যারা কোনো না কোনো উদ্দেশ্য, কোনো না কোনো ভাবে দৃঢ়সংবদ্ধ দল গড়তে পারলো, অর্ধস্ফুট বা পূর্ণাবয়ব নেশন স্টেট হয়ে গড়ে উঠলো, নানা লোভে নানা কারণে এখানে তারা হানা দিয়েছে কখনও বা দস্যুর দলে, কখনও বা ব্যবসায়ের ছলে, কখনও বা পররাষ্ট্র অধিকার করে সমৃদ্ধ, শক্তিমান হয়ে উঠবার উদ্দেশ্যে। বাধা এখানে তারা পেয়েছে,

ক্ষেত্রবিশেষে প্রবল বাধা পেয়ে পর্যুদস্তও হয়েছে। কিন্তু দুর্বলতা যার নিজের ভিতরেই, পড়তে তাকে হবেই। ঐ জাতীয়তা ও ঐক্য-বোধের দুর্বলতায় আমরা ক্রমে পরাজিত হয়েছি। এই পথে এসেছিল আমাদের কয়েক শতাব্দীর দাসত্ব—অভিশাপ হলেও যাকে আমরা শেষ পর্যন্ত বর হিসাবে মেনে নিয়েছি—যেন আমরা একপাল গৃহপালিত পশু।

হীনতার এই নিম্নতম স্তরে নেমে আসতে জাতির মনীষীশ্রেণীর যাঁরা দেখা দিলেন, তাঁদের চোখে পড়লো, কি ছিলাম, কি হয়েছি, কি হতে চলেছি। রাজা রামমোহন থেকে গোটা শতাব্দীটি ধরে প্রয়াস চললো জানবার, জানাবার কি ভাবে কি কারণে আমরা পড়েছি, কোন পথে আবার আমরা উঠব। অন্য জাতির প্রগতির ইতিহাসও তাঁরা দেখলেন। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্ত হল, একান্তভাবে অন্যকে অনুকরণ করেই আমরা উঠব—এ হয় না। যাকে অনুকরণ করব, তার পেছনেই থাকব, আর, তার অস্ত্রে তার হাতে মার খাব। দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে আগে মনের দাসত্ব ঘুচাতে হবে। অন্যেরা যেমন করে যেসব দিকে বড় হয়েছে, শক্তিমান হয়েছে, উপায়ে, লক্ষ্যে আমরা তাদের ছাড়িয়ে যাবার প্রয়াস পাব। কিন্তু নিজেকে হারিয়ে নয়, নিজেকে ফিরে পেয়ে, নিজেরই সত্তার উপর দাঁড়িয়ে।

একদিন আমরা বড় হয়েছিলাম আত্মচিন্তার পথে—সত্যিকার আত্মচিন্তা—যে-চিন্তায় আমার আত্মা বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত। সেই চিন্তায় প্রথম আমি আমার স্বদেশ-আত্মার সঙ্গে এক। এই আমার প্রথম বৃহত্তর সত্তা। আমি আমার মুক্তি চাই আমার স্বদেশের মুক্তি-সাধনার লক্ষ্যে। এ শুধু আত্মিক মুক্তি নয়, পার্থিব মুক্তিও—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক—সর্ববিধ মুক্তি। আমার মুক্তিসাধনার উপায়ও আমার স্বদেশের মুক্তিসাধনার ব্রত উদ্‌যাপনে। আমার স্বদেশের মুক্তি চাই মানবের মুক্তিসাধনার লক্ষ্যে। আমার মুক্তি নাই, প্রতিটি মানুষেরও যতদিন মুক্তি নাই, কারণ, সে আমার বৃহত্তর সত্তার অঙ্গ। বদ্ধ আমি, মুক্ত আমি—সবেরই ব্রত সমগ্র মানবসমাজের মুক্তি-

সাধনা। মানুষের এই যে মহত্তম সাধনা, তার প্রশস্ততম পথ নিষ্কাম কর্ম। এই নিষ্কাম কর্মের আদর্শে গড়ে-ওঠা মানুষের মুখেই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভাষা ফুটেছিল—আমরা মরব, জাত জাগবে। জেগে উঠে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর জাত মুক্তির দীক্ষা নেবে। প্রথম আমাদের রাজনৈতিক দাসত্বের অবসান ঘটাবে।

ইদানীংকার ভারতে জন্ম নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, অনেকে প্রশ্ন করেন, সে-যুগের বিপ্লবী যাঁরা দেশে বিপ্লব-সৃষ্টি করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের প্রোগ্রাম কি ছিল। আজকের বিপ্লবী পরিভাষা যাকে প্রোগ্রাম বলে—একথা মেনে নিতে লজ্জা নেই—সে-যুগের বিপ্লবীদের তেমন কিছু ছিল না। সে-যুগে তাঁরা কতকটা ঘুমের ঘোরে পথ খুঁজছিলেন। সে-যুগে প্রোগ্রাম বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা পাই এখানে যে, সুরেন্দ্রনাথ যখন বিগত শতাব্দীর শেষ আর বর্তমান শতাব্দীর প্রথম জাতিকে শোনাচ্ছিলেন ভারতীয় জাতির ঐক্যের বাণী তখন অন্য যুগস্রষ্টারা—বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিন পাল, সতীশ মুখার্জি প্রোগ্রাম বলে যা দিলেন তার মর্মকথা এই: বিদেশী রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে জাতিহিসাবে আমরা অস্বীকার করব, করে রাষ্ট্রের কাজ যা যা, তা আমরাই করব, আমাদের স্বাধীন সত্তা নিয়ে আমরা উঠে দাঁড়াব।

এ-প্রোগ্রামের অন্যতম প্রচারক অরবিন্দ কিন্তু দেখলেন, এমন কথা বলতে পারে যে জাতি, সে-জাতির অস্তিত্ব তখনও কল্পনায়। জাতির জীবনে জাগরণ এলে, জাতির জাতীয় সত্তার বোধ এলে তবে না সে তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে দাঁড়াবে। প্রথম কাজ তাই জাতিকে জাগানো। জাতিকে জাগাবার পথ হিসাবে মনীষীরা সাহিত্য সৃষ্টি করছিলেন, সংবাদপত্র প্রকাশ করে, বক্তৃতা দিয়ে নির্যাতিত হচ্ছিলেন। কিন্তু সেদিনের জাতিকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, এসব উপায়ে যে-প্রচার, তার প্রভাব বিস্তৃতির দিকে কিছুদূর গেলেও, গভীরতার দিকে বড় বেশি দূর নয়। আর, যুগ যুগের অসাড় একটা জাতি গভীর

মর্মে আঘাত না খেলে কি জাগার মতো করে জাগে—যাতে করে সে স্বাধীন রাষ্ট্রের কল্পনা করতে পারে?

তা হলে পথ কি? পথ পরিপূর্ণ আত্মবিলোপের, আত্মদানের পথ। ভারতের একান্ত নিজস্ব পথ, ঐ 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে'র পথ। যুগধর্ম হিসাবেই যেন সেদিনের মুষ্টিমেয় যুবক পেল নিষ্কাম কর্মের আদর্শ। নিষ্কাম কর্মেই মুক্তি। নিজের মুক্তির জন্যে নয়, দেশের মুক্তির আদর্শে পাগল যুবকদের ভিতর প্রশ্ন যে করলো, সে জবাবে শুনলো, নিঃশেষে নিজেকে দিয়ে দেশের মানুষের মনে চমক লাগাতে হবে, চমকে ঘুম ভেঙে জানতে চাইবে: এ কি? এ কোন্ পাগলের দল? কেন এভাবে জীবন দিচ্ছে এরা? কি চায় এরা? কি চায়, তাই বহু ঘুমন্ত শতাব্দীর শেষে স্তরের পর স্তর জেগে উঠে জানতে চাইবে। নব উষার নব জাগরণের এই আজ একমাত্র পথ। এমনি পাগলের দল সৃষ্টির কাজে লাগলেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁরই ইঙ্গিতে নিরলম্ব, হেম দাস—আরও কেউ কেউ নীরবে নিঃশব্দে মানুষ-বোমা সৃষ্টি করে চললেন। সেই বোমা ফাটলো—প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম, সত্যেন আর কানাই শহিদ হলেন। জাতির ভিতর প্রথম জাগরণের সাড়া জাগলো। ভারতের বিপ্লব-আন্দোলনের এই প্রথম পর্ব।

এর পরের পর্ব দেখা দিল যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। তাঁর সংকল্প: ব্যক্তিগত আত্মত্যাগের স্তরকে অতিক্রম করে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে স্থানে স্থানে দলে দলে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করতে হবে—জাতিকে দেখাতে হবে, ইংরেজের শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব। এতে করে জাতির আত্মবিশ্বাস জাগবে, দেশে জাগরণের উৎসমুখ প্রসারিত হবে। প্রকৃষ্ট সময়—শাসকজাতি যখন কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। জার্মানি ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন করছে জেনে তার অস্ত্রসাহায্য পাবার ব্যবস্থা হল। সারা উত্তর ভারতে সৈনিক-বিদ্রোহ ও যুদ্ধের আয়োজন হল। সঙ্গে রইলেন রাসবিহারী। কিন্তু আয়োজন ব্যর্থ হল। যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরের যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলেন। রাসবিহারী দেশান্তরিত হলেন। অনেকে প্রাণ দিলেন। কিন্তু

বিপ্লবীদের অভীষ্ট সিদ্ধ হল। সারা ভারতে জাগরণের চাঞ্চল্য খেলে গেল।

এখানেই—বিপ্লবীদের এই বার বৎসরের মৃত্যুবরণ সাধনার পর—এলেন গান্ধীজি প্রথম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে। ইংরেজের বিপদের দিনে ইংরেজের শত্রু জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগে বিপ্লবীরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আয়োজন করেছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সে ক্রূর নিষ্পেষণের উদ্দেশ্যে এক আইন প্রণয়নে বদ্ধপরিকর হল। এই রাওলাট আইনের প্রস্তাবের সূত্রেই গান্ধীজি জাতিকে সংগ্রামের আহ্বান জানালেন। তাঁর প্রোগ্রাম ভিন্ন। কিন্তু নতুন নয়। যে প্রোগ্রামকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ জাতিকে শহিদ সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছিলেন, শহিদের আত্মদানে জাতিকে জাগাবার বুদ্ধি দিয়েছিলেন, এ সেই প্রোগ্রাম—বিদেশী রাষ্ট্রকে অস্বীকার করে সেই রাষ্ট্রের কুক্ষির ভিতরেই জাতির স্বাধীন সত্তার প্রতিষ্ঠা দেবার প্রোগ্রাম। বিপ্লবীদের প্রশ্নে গান্ধীজির জবাব মিললো, তাঁর প্রোগ্রাম দেশ গ্রহণ করলে কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক ভারতের পার্লিয়ামেন্ট বলে ঘোষণা করা হবে এবং এক বছরের ভিতরই করা হবে। সম্ভাবনা দেখা দিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সদাজাগরণচঞ্চল ভারতের জনগণের সাক্ষাত সংঘর্ষের। বিপ্লবী ভারত এই তো চায়।

কিন্তু জাগরণ তখনও জাতির এমন নয় যাতে এই সংঘর্ষ সারা জাতির জীবনে চারিয়ে যেতে পারে। উপরের স্তরেই রয়ে গেল এবং অচিরেই স্তিমিত হয়ে এল। কিছু কিছু ত্রুটি খুঁজে বের করে নেতৃত্বের উপরই সব দোষ চাপানো কোনো আন্দোলনের ঠিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নয়, ভাবাবেগপ্রধান চিন্তা। একটা জাতির চরিত্র যেমন, তার সরকারের চরিত্রও তা থেকে পৃথক হতে পারে না—তেমনি একটা জাতির দুর্বলতাই তার নেতৃত্বে প্রতিফলিত হয়। এই কারণেই গান্ধীজির প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন তখনকার মতো ব্যর্থ হল। বিপ্লবীরা তাঁদের পুরানো পন্থায় ফিরে যাবার আয়োজন শুরু করলেন।

কোনো আন্দোলনেরই গতিপথ ঋজু নয়। বাংলার বিপ্লবান্দোলনেও নানা শক্তির আবির্ভাবে পথ জটিল হয়ে ওঠা আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়। হয়েছেও। বাংলার বিপ্লবীশক্তির উত্থানের মূলমন্ত্র যা তার কথা বলেছি। সে ছিল নিঃশেষে নিজেকে মুছে ফেলা। এ থেকে সে যুগে দেখা গেছে এক অভূতপূর্ব মন্ত্রগুপ্তির, আত্মবিলুপ্তির সব দৃষ্টান্ত। একটির উল্লেখ করা যাক--অতুলনীয়চরিত্র বিপ্লবনেতা যতীন মুখার্জির জীবন ও দান। তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ সহচরদের বিশ বছরের ঐকান্তিক চেষ্টাতেও আজ পর্যন্ত তার অনেক-কিছু জানা যায় নাই, নিত্য নতুন তথ্য নানা সূত্রে আবিষ্কৃত হচ্ছে। এই মন্ত্রগুপ্তির সাধনার ধারামুখে দেখা দিল কংগ্রেস আন্দোলন। বিপ্লবীরা দুয়ের সঙ্গেই যুক্ত। এর একটি চেয়েছে আত্মবিলোপ, অপরটিতে প্রয়োজন হয়েছে আত্মপ্রকাশের। দুই বিপরীতমুখী আদর্শের পারস্পরিক অনুপ্রবেশ। ইতিহাসের গতিপথে এই ধরনের interpenetration of opposites পদে পদেই হচ্ছে।

এমনি বিপরীতধর্মী বস্তুর পারস্পরিক অনুপ্রবেশের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃতি পেল বিপ্লবী দলের ইতিহাসে। আবহমানকালের জাতীয় চরিত্রে নিজেকে মুছে ফেলার প্রতিযোগিতা ছিল কতকটা অনৈসর্গিক। আদর্শনিষ্ঠা যতদিন সহজ সরল ধারায় সতেজ ছিল, ততদিন এই প্রতিযোগিতায় আনন্দ ছিল, গৌরব ছিল। কিন্তু বালেশ্বরের যুদ্ধের পর থেকে সংঘর্ষের দ্বিতীয় স্তর যেমন ধীরে ধীরে অতীতে মিলিয়ে যেতে রইলো, প্রাচীন চরিত্রের পুনরাবর্তন শুরু হল -প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করলো। সেখানেও প্রতিযোগিতা দেখা দিল। অমুক কাজ আমি করেছি, অমুকটা আমার দলের দান—এই সব ভাষা শোনা যেতে লাগলো। প্রতিযোগিতার পরিণতিতে কথা উঠলো, পুরোনো বিপ্লবীরা আর কিছু করবেন না। পুরোনো বিপ্লবীই—যাঁরা আন্দামানে, জেলে, অন্তরীণে দুঃখদুর্গতি সয়ে এসেছেন, তাঁরাও কেউ কেউ পরস্পরের সম্পর্কে এমন কথা বলতে রইলেন। অন্যেরা তো বটেই।

১৯২২-২৩ সাল থেকে বাংলায় গুপ্তসমিতির পক্ষে এটি হয়ে দাঁড়ালো এক সর্বনাশা ধ্বনি। যাঁরা কিছু করছেন বা করবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাঁরাও প্রতিষ্ঠার নবজাগ্রত প্রবৃত্তিবশে বলতে শুরু করলেন কি তাঁরা করছেন বা ভাবছেন। গুপ্তসমিতির প্রধান সম্বল যে মন্ত্র-গুপ্তি, তা অনেক ক্ষেত্রে বজায় রইলো না, কথা স্বভাবত অবাঞ্ছিত-কেন্দ্রেও পেঁাছে যেতে লাগলো। যাঁরা গোপন কাজের ভার অন্যের হাতে দিয়ে বিপ্লবাদর্শেরই স্বার্থে নিজেরা কংগ্রেসের বা অন্য ধরনের প্রকাশ্য কাজে লিপ্ত, তাঁদের প্রতিষ্ঠায় সহজেই আঘাত এল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা গোপন কাজের দায়িত্ব যাঁদের, তাঁদের অনুরোধ জানালেন বিশিষ্ট কর্মীদের ডেকে কি আয়োজন হচ্ছে না হচ্ছে তার আভাস দেবার। এ-অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হল। কারণ, এ-অনুরোধ গুপ্তসমিতির মূল প্রকৃতিকেই অস্বীকার করে। স্বভাবতই পৃথক চেষ্টা শুরু হল। এবং তেমনি স্বভাবতই তা ব্যর্থ হয়ে গেল। একদল কিছু করছেন না বলে সে দলে ভাঙন ধরিয়ে অপর দল বা দলের সমষ্টিকে দাঁড়াতে গেলে এমন কলরব, এমন জাঁকজমক করা প্রয়োজন হয় যে, তার সঙ্গে কোনো গোপন আয়োজনের কোনো সঙ্গতি থাকে না। সে আয়োজন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের চোখ এড়ালেই বরং আশ্চর্য হতে হত। এ-ই বাংলার বিপ্লবীদলের ১৯২৯ সালের ইতিহাস।

এসে গেল ১৯৩০ সাল। ইতিপূর্বে ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে বাংলার প্রবর্তনায় সর্বভারতীয় বিপ্লবীদের চাপে গান্ধীজি কথা দিয়েছেন, ইংরেজ সরকারকে এক বছরের সময় দেওয়া হবে, এর ভিতর যদি সে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন না দেয়, ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা লক্ষ্য ঘোষণা করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন। বিপ্লবীরা জানেন, তখনও সর্বভারতীয় বিপ্লবান্দোলনে তাঁদের নেতৃত্ব নেবার পক্ষে ক্ষেত্র প্রস্তুত নয়; নেতৃত্ব গান্ধীজির হাতেই থাকবে। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে জাতির উপর যদি বর্বর অত্যাচার চলে এবং

তা চলবেই, বিপ্লবীরা যেখানে যেমন পারেন জবাব দেবেন, মারের বদলে মার দেবেন। মারের শক্তিতে সাম্রাজ্যবাদীর সাথে পারা যাবে না কিন্তু এতে যে সংঘাত দেখা দেবে তাতে জাতির সংকল্প বেপরোয়া হবে, মরিয়া ধরনের হয়ে উঠবে। এই অগ্রগতিই তখন বিপ্লবীরা চাইছিলেন। তাঁদের মুখপত্র স্বাধীনতা ১৯২৯-৩০ পুরো বছরটি ধরে প্রায় স্পষ্ট ভাষায় একথা প্রচার করে চললো।

প্রচার ছাড়া এর আয়োজনও চলছিল যার যার সাধ্যমতো গুপ্ত-সমিতির রীতিনীতি বজায় রেখে বিকেন্দ্রিক দলের হাতে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, গোপন আয়োজন এককেন্দ্রিক দলের চেয়ে বিকেন্দ্রিক দলেই ভাল চলে, একালে ষড়যন্ত্রের মামলায় সব পন্ড হয় না। লক্ষ্য ও পদ্ধতির সাধারণ আলোচনার বাইরে প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াস কম ক্ষেত্রেই দেখা দিয়েছে। ১৯১৪-১৫ সালের মতো এর প্রয়োজন তেমন ছিল না। পুলিশের কাছে সুবিদিত নেতারা অনেক ক্ষেত্রে সেই প্রাচীন রীতিনীতির অনুসরণে স্বেচ্ছায় দায়িত্ব অপরের হাতে, বয়ঃকনিষ্ঠদের হাতে তুলে দিয়েছেন, কারণ, বেশি সন্দেহভাজনদের পক্ষে আয়োজন অনেক সময় পুলিশের নজরের বাইরে রাখা শক্ত হয়ে পড়ে। ভবিষ্যৎ বিপ্লবের স্বার্থে দায়িত্ব নেবার আগ্রহ বেশি লোকের ভিতর সৃষ্টিরও প্রয়োজন ছিল। সূর্য সেন এ হিসাবের বাইরে। তিনি বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রবর্তনার ভার নিয়েছিলেম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগের পরে। আর, তাঁর হিসাবে, তাঁর বিবেচনায় তাঁর ১৯২৪-২৫ সালের ক্রিয়াকলাপকে পুলিশ তেমন গুরুত্ব দেবে না, একথা মেনে নেওয়া হয়েছিল। অপরদের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, ১৯২৪-২৫ সালে অধিকাংশ পুরোনো নেতৃবর্গ যখন কারারুদ্ধ, রুগ্ন শৈলেশ্বর বোস তখন দায়িত্ব তুলে দিলেন রসিকলাল দাসের হাতে; তেমনি ১৯২৯ সালে হেম ঘোষ তুলে দিলেন ভূপেন রক্ষিত রায়ের হাতে। সূর্য সেনের মতো ললিত বর্মণের দৃষ্টান্তও খানিকটা স্বতন্ত্র। দীর্ঘ দশ বৎসর প্রদেশের এক প্রান্তে তিনি খাদিচরকার এমন আবরণের ভিতর ছিলেন যে, বিপ্লব-ক্ষেত্রে

তাঁর সম্পর্কে পুলিশের অনেকটা নিরুদ্বেগভাব এসে গিয়েছিল। এঁদেরই—সূর্য সেন, রসিক দাস, ভূপেন রক্ষিত রায়, ললিত বর্মণ, ধন্বন্তরি, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং আরও অনেকের নেতৃত্বে, প্রবর্তনায়, প্রেরণায়, আয়োজনে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত চললো ঢেউয়ের পরে ঢেউ প্রলয়ের মাতন, বিশ্বের চমকলাগানো আত্মদানের সেই আদি-যুগের সাধনা, মৃত্যুর ঝলকের পর ঝলক—যে-মৃত্যু জাতির কাছে এনে দিল তার জীবনের সম্বল। সেই সম্বল নিয়েই এর পর ১৯৪২-এ ভারতে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যম সম্ভব হয়েছিল।

বিপ্লবী ভারতের ১৯৩০-এর এই বজ্রস্ফুরণের যুগের ডেটিনিউ অমলেন্দু দাশগুপ্ত। চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার আক্রমণের দুঃসাহসিক ঘটনার পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সন্দেহভাজনদের, যাঁদের দিক থেকে বিপদ আসার সম্ভাবনা, তাঁদের মুক্ত জীবনে রাখা সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠলো। এমন কর্মীদের দলে দলে বিভিন্ন জেলায় বিনাবিচারে বন্দী করলো। সেই ১৯০৭-৮ সাল থেকে জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য ক'রে যাঁরা দেশে বিপ্লবের সাধনা করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বিদেশী সরকার আইন, বিচারের মর্যাদা রক্ষা ক'রে চলতে অস্বীকার করেছে—এমন তো কতবারই দেখা গেছে। চঞ্চলতা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অল্প-বিস্তর লোককে বিনাবিচারে বন্দী করেছে। সেই প্রথম যুগে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন ছাড়া এমন আইন ছিল না—যাতে দলে দলে লোককে বিনাবিচারে আটক ক'রে জেলে রাখতে পারে। কিন্তু এই ৩নং রেগুলেশনে রাখার অসুবিধা ছিল, কারণ এতে কেন্দ্রীয় আর প্রাদেশিক সরকারের অনেক ব্যাপারে একমত হবার প্রয়োজন হ'ত, আর এতে বন্দীদের কিছু কিছু অধিকার, কিছু কিছু সুযোগসুবিধা দিতে হ'ত। এইজন্য ১৯২৪ সালে রাওলাট আইনের এক অংশের অনুকরণে আইন প্রণয়ন করে। এবং এই আইনের বলে তখন, ১৯৩০ সালে এবং ১৯৪০ সালে বহু লোককে বিনাবিচারে জেলে বা ক্যাম্পে বন্ধ ক'রে রাখে। ৩নং রেগুলেশনে যাঁদের বন্দী করা হ'ত, তাঁদের সাধারণত বলতো স্টেট-

প্রিজনার বা রাজবন্দী, আর এই নতুন আইনের বন্দীদের বলা হ'ত ডেটিনিউ।

অমলেন্দুর বর্তমান গ্রন্থ এই ডেটিনিউদের কাহিনী। অমলেন্দু বিপ্লবী। বলতে গেলে তাঁর শৈশবও তখন পার হয় নাই, একদিন দেখলেন, তাঁর দুই দাদাকে পুলিশ ধ'রে নিয়ে গেল, বাড়ী খানা-তল্লাসের নামে অনেক জুলুম ক'রে গেল। বছর দুই পরে একদিন তিনি শুনলেন, তাঁর সেই দুই দাদা, নীরেন আর মনোরঞ্জন বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে রাজশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যুদ্ধবন্দী হলেন, তারপর ফাঁসিকাষ্ঠে শহিদের অমরত্ব লাভ করলেন। ব্রতে আত্মোৎসর্গের জন্যে আর কি তাঁকে কোনো প্রতিজ্ঞা দেবার বা তাঁর পক্ষে কোনো প্রতিজ্ঞা নেবার প্রয়োজন ছিল? আত্মোৎসর্গের সহজ প্রতিজ্ঞাই তাঁর রক্তের সাথে মিশে গেল। তিনি চিরন্তন বিপ্লবী-আত্মার সাথে এক হয়ে গেলেন। দুটি ছত্রে সেই বিপ্লবী-আত্মার যে-পরিচয় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা কম—"এদের জীবন দেখিতে ছোট হইলেও আসলে তাহা ইতিহাস-জাতীয়। পৃথিবীতে ছোট নদীও আছে। জল থাকিতেও সরোবর-দীঘি-বিল তার আত্মীয় নয়, গঙ্গা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের শোণিতই তার স্রোতে।"

এই নদীর জীবন যে-বিপ্লবীর, অন্তরে সে নদীর মতোই বাঁধন-হারা হয়ে ছুটেছে। ডেটিনিউয়ের জীবনে দুঃখ আছে, বিপদ আছে, ভয় আছে, শাস্তি আছে, বিনাবিচারে বন্দী থেকেও বন্দুকের গুলিতে তাদের কারওবা মৃত্যু ঘটেছে, কারওবা আহত হ'তে হয়েছে। কিন্তু নদীর মতোই বিপ্লবীর আত্মাকে এসব স্পর্শ করে না। সে তার একান্ত সত্তায় জানে, এসবতো আছেই, যখন আসবার আসবে, সে তার জন্যে 'মৃত্যুর পূর্বেই অনেকবার ক'রে মরে' না। সাধারণ মুক্ত জীবনে যেমন হাসি আনন্দ কলকোলাহল, গল্প আমোদ রসিকতা ডেটিনিউয়ের জীবনেও তার কোনো অপ্রতুল নেই। বরং সে যেন আরও স্বচ্ছন্দ, কারণ সংসারের জীবনের নানা হিসাব, নানা চিন্তা, নানা শঙ্কা তাকে ম্লান করে না, সঙ্কীর্ণ, সঙ্কুচিত করে না।

অমলেন্দুকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই জানেন, অমলেন্দু মজলিসী মানুষ। ডেটিনিউয়ের জীবনের তিনি যে ছোট ছোট চিত্র এঁকেছেন, তার প্রত্যেকটিই যেন তাঁর হাতে হয়ে উঠেছে এক একটি মনমাতানো মজলিস। একবার তার পাশে বসলে ইচ্ছা হয় যেন তার শেষ না আসে। যেমন তার ভিতর বকসা ক্যাম্পের খান্ডারবাণীর আসর, তেমনি ফরিদপুর জেলে ভুরিভোজনের বর্ণনা, তেমনি দেউলি ক্যাম্পে ফণি দত্তের অনিদ্রার গল্প। অমলেন্দু কবি, অমলেন্দু সাহিত্যিক। রসসৃষ্টি কেবল তাঁর সুনিপুণ হাতের তুলির কাজ নয়, সে এক কবিপ্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত ঝর্নাধারার একান্ত নিজস্ব ছন্দে আপন গতিতে বয়ে যাওয়া।

কিন্তু এসবের উপর অমলেন্দু সাধক। এবং সে এক পরম বিস্ময়ের বস্তু। কয়েকটি লাইনে অমলেন্দু আগের যুগের বিপ্লবীদের একখানি ফটো তুলে ধরেছেন—"পুরোনো আমলের লোক, নিজেদের বিষয়ে গল্প করিতে তেমন অভ্যস্ত হন নাই। সে-কালের শিক্ষা—মুখ বুজিয়া কাজ করিয়া যাওয়া।...জীবনে যেন একটা গোপন নীরবতাকে বহন করিয়া লইয়া মৃত্যুর নীরবতার দুয়ারে পৌঁছাইয়া দেওয়াই এঁদের একমাত্র কাজ। কত কর্মী যে এইভাবে নিঃশব্দে কাজ করিতে করিতে শেষ হইয়াছে, বাহিরের লোকে তার খোঁজ রাখে না, জানেও না। নিজেদের কোন দাবীদাওয়া না রাখিয়া এভাবে জীবন কাটাইয়া দিতে চরিত্রের যে-নিরাসক্তি ও দৃঢ়তার দরকার, তার জন্য সাধনার প্রয়োজন হয়।" কিন্তু এ সেই বিপ্লবীদের কথা, যাঁদের বন্দীজীবনেও বাইরেও ধ্যানের বস্তু ছিল—'জীবন তুচ্ছ, সকলেই দিতে পারে'; 'আর কি আছে, আর কি দিব?—'ভক্তি'।

অমলেন্দু তার এক যুগ পরের ডেটিনিউ, যখন ভক্তির ধ্যানের এই যুগ অতীতে মিলিয়ে গেছে, তার জায়গায় এসে গেছে এক বিচারের যুগ, সমালোচনার যুগ এবং কতকটা অসূয়া (cynicism)র যুগ। অমলেন্দু কিন্তু বার বারই দেখি, এত যে তাঁর হাসি-আনন্দ,

মজলিস আর রসসৃষ্টি, কখন যে তার ফাঁকে ফাঁকে নিজেকে নিয়ে একান্তে উধাও হয়ে গেছেন, "খণ্ড আবদ্ধ আবেষ্টনী হইতে ক্ষণিকের অসীমতায়" বিলীন হয়ে গেছেন, সে এক নিতান্ত অপ্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য। সিউড়ি জেলে তাঁর দেখা তাঁরই হাতে আঁকা তেমনি এক বিস্ময়কর চরিত্রের ভাষায় নিজে জীবনে কি পেয়েছেন এই বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে তার পরিচয় দিয়েছেন—"যে-মানুষ একাকী নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, নিজেকে নিজের মধ্যে খোঁজ করেছে, সেই জানে যে, গভীরে নেমে গেলে কেন প্রেম-করুণার উৎসের মুখ খুলে যায়, মানুষের সঙ্গে কেন তখন অন্য ব্যবহার মিথ্যা ও অসম্ভব ব'লে বোধ হয়।" সাধারণ অর্থে আমরা বিপ্লবী বলতে যা বুঝি, এখানে এসে কে কোন্ সাহসে বলবে, অমলেন্দু সেই বিপ্লবী?

শতাব্দীর ঊষায় বিপ্লবীরা নিজেদের জীবন পণ ক'রে যখন নবজীবন সৃষ্টির ব্রত নিয়েছিলেন তার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত জাতির জীবনে অমলেন্দুর ভাষায় "বর্তমানের ও প্রাত্যহিকতার যে ছায়া-আস্তরণ" পড়েছিল, বিগত ত্রিশ বৎসরে সে আবার তার নিবিড় কালো ছায়ায় গ্রাস করেছে সমগ্র জাতির সত্তাকে। এর পরিণতি কোথায়, আজ যেন তা দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেছে। আজ তাই অমলেন্দুর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে ইচ্ছা যায় : "আর কত নামিব উপরে উঠিবার আহ্বান আসার সময় কবে আসিবে? মানুষের নিম্নতম পতন তো দীর্ঘদিনই দেখিলাম! মানুষের উচ্চতা কত ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে, এবার তার জন্য ডাক কি শুনিতে পাইব না? পাইলে, সে কবে?" নিজের "বর্তমানের ও প্রাত্যহিকতার" বাইরে আপন অতল গভীরে ডুব দিয়ে আজকের যুবক কবে আবার সেদিনের সেই ডোটিনিউয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে?

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত



"জানিও মনে চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথী আছেন হিয়া মাঝে,
তাপস তিনি তিনিও সদা একা,
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে' দেখা।"

বড় একাকী বোধ করিতেছি।

একাকী মানুষ যে এত ভয়ানক তা জানিতাম না। নিজেকে নিজেই যেন কেমন ভয়াবহ মনে হয়। যে লোক নিজের মধ্যে নিজে আশ্রয় পাইয়াছে, নির্জনতা কেবল তারই শোভনীয় ও সহনীয়। আমাদের মত সাধারণ মানুষকে মানুষের সমাজ হইতে সরাইয়া আনিলে আমরা মৃতের সামিল হইয়া যাই। নির্জনতা ও একাকিত্বের মধ্যে গেলেই আমাদের অস্তিত্বের দম বন্ধ হইয়া যায়। মনে হয়, আমরা যেন সত্যই হারাইয়া গিয়াছি। এই নিঃসঙ্গ একক অনুভূতি আমার নিকট আমার এক নূতন পরিচয় আনিযাছে।

এই একাকিত্বের পীড়ন হইতে মুক্তি চাই, কিন্তু মুক্তি তো সুলভ নহে। কে জানিত এজন্য সৌভাগ্য ও সাধনা দুইই থাকা চাই।

শাস্ত্রে নাকি আছে—অগ্রে তিনি একাই ছিলেন, একক নিজেকে সান্নিধ্য দিবার জন্য তিনি সৃষ্টিকে বাহিরে আনিলেন। মাকড়সা যেমন নিজের মধ্য হইতে সূতার পর সূতা বাহির করিয়া জাল বুনিয়া থাকে, তিনিও (যিনি অগ্রে একা ছিলেন) নিজের মধ্য হইতে সৃষ্টিটা বুনিয়ে বাহিরে আনিতেছেন। তাঁর এই সৃষ্টিকৌশল কবিকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল, তিনিও জানিতে চাহিয়াছিলেন—"তুমি কেমন করে গান করহে গুণি!"

মনে হয়, আমাদেরও ভিতরে একটা মাকড়সা আছে, সেও জাল বোনে—স্মৃতি ও কল্পনা দিয়া। বিধাতার যাহা সৃষ্টি, আমাদের তাহা কল্পনা। কল্পনা যখন অতীতের দিকে মুখ ফিরায়, তখনই স্মৃতিতে রূপান্তরিত হয়।

বর্তমান হইতে মুক্তির পথ দুদিকে প্রসারিত—একটি গিয়াছে ভবিষ্যতের দিকে, অপরটি গিয়াছে অতীতের অভিমুখে। স্মৃতির পথ ধরিয়া অতীতের দিকে মন তাই বারবার বাহির হইতে চায়—এই একাকিত্ব হইতে মুক্তির জন্য।

মানুষের ব্যক্তিগত সীমানায় যাহা স্মৃতি, ইতিহাসের বিরাট পটভূমিকায় তাহাই অতীত। এই অতীতকে কবি মিনতি করিয়াছেন—

"কথা কও, কথা কও।"

পিছনে ফিরিলে দেখি, সাতবছরের মৃত দিনগুলির দীর্ঘ কঙ্কালশ্রেণী পড়িয়া রহিয়াছে। জেলখানায় এই দিনরাত্রিগুলির অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। এই প্রেতদিবস-গুলির উদ্ধার কেমন করিয়া হইবে? কঙ্কালকে কথা কহাইতে পারেন, সে শবসাধক সন্ন্যাসী কি আমাদের মধ্যে আছেন? আমরা শুধু পারি কবরের ধারে বসিয়া কাঁদিতে, আর পারি বলিতে—"কথা কও, কথা কও।"

কান পাতিলে হয়তো ভিতরে কথা শোনা যায়। কিন্তু কানকে যে বাহির হইতে ভিতরের দিকে ফিরানো দরকার সেজন্য। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছিলেন—"বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।" ভাগ্যবান ব্যক্তি!

গোপন দরজাটার দিকেই বোধ হয়—"মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।" দরজা বন্ধ। ঈশ্বরের ছেলে ভরসা দিয়াছেন—knock, কড়ানাড়া দাও; it shall be opened unto you—দেখ, দরজা খুলিল বলিয়া। কিন্তু এ কিসের দরজা? বাসর ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া "ওগো বর, ওগো বঁধু"! "পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিদ যাই মনের হরিষে"--ছলনাময়ীর এ কপট নিদ্রা ভাঙ্গাও।

এখন "বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।"

প্রেসিডেন্সি জেল
২৬শে আষাঢ়—'৪৪

জেলখানা তার কপাট দুইটা খুলিয়া একটা অতিকায় জন্তুর মত তার উদরে আমাদিগকে একদিন গিলিয়া লইয়াছিল। তখন মনে মনে ভরসা ছিল যে, কিছুদিনের মধ্যেই উদ্গার করিয়া বাহিরের জিনিস বাহিরকে ফিরাইয়া দিবে। তখন কে সন্দেহ করিয়াছিল যে, অতিকায় বড় জন্তুটি গিলিতে যত তৎপর গিলিতবস্তু উদ্গারে সেই অনুপাতে ঢিলা ও অনিচ্ছুক। সাত বছর পার হইয়া গেল, মুখটি খুলিবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ভিতরের জারকরস যন্ত্রের সহিত সারাদেহে মশলার মত মাখাইয়া লইয়া আমাদিগকে সে পরম পরিতোষের সহিত লেহন করিতেছে বৎসরের পর বৎসর। লেহনের মাঝে মাঝে দু-একটা চর্বণও সে দিয়া লয়। বুঝিতেছি, চর্ব্যপর্যায়-ভুক্ত বস্তু নাই, নতুবা চিবাইয়া শেষ করিতে এতদিন লাগিত না, দুদিনের দুকামড়েই আমাদের খাদ্য-জন্ম ঘুচাইয়া দিত। আমরা আসলে লেহ্য ও চোষ্যজাতীয় জীব, ভিতরে বোধ হয় শক্ত এমন কিছুই নাই যাতে চর্বণের প্রয়োজন হইবে।

ভিতরে ঢুকিয়াছি একদিন, সরকারের বদনাম রটাইবার জন্য শত্রুতা করিয়া যদি না মরিয়া যাই, তবে বাহিরে যাইবও একদিন। কিন্তু সেই ঢুকিবার একদিন, আর বাহির হইবার একদিন—এ দুইটা দিন মিলাইয়া দেখিলেই ধরা পড়িবে—"মা কি ছিলেন, আর কি হইয়াছেন।"

হাতীতে-খাওয়া কয়েতবেলটি বাহ্যতঃ দেখিতে নিখুঁত, কিন্তু ভিতরে নাকি শূন্যকুম্ভ ইব। আমাদেরও একদিন পুণ্যবল ক্ষীণ হইবে, ভুক্ত কপিত্থের ন্যায় জেল-স্বর্গের ঐরাবত আমাদিগকে মর্তের মাটীতে ছুড়িয়া ফেলিবে। আপনজনেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া কুড়াইয়া লইবেন, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া মুখ বাঁকা করিবেন, ভাবিবেন,—দুধেজলে-মিশানো পানীয় হইতে দুধটুকু গ্রহণ হইয়াছে দেখিতেছি, স্বর্গ হইতে রক্তমাংসের মানুষটার রক্তমাংস সবই

ফেরৎ আসিয়াছে, কিন্তু মানুষটা কোথায়! অতএব—"সে কোথায়, সে কোথায়।" আমরা সরমে মরিব না, প্রাণে যদি তখনও বাঁচিয়া থাকি, তবে চিঁহি চিঁহি গলায় ক্ষীণস্বরে গর্জন করিব—"সে যে আমি, সেই আমি।"

অভিনেতারা একই রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে বটে কিন্তু প্রত্যেকের প্রবেশভঙ্গী ও রকমসকম স্বতন্ত্র। ভীম যেমন করিয়া আসরে আসিবেন, তার বড় ভাই যুধিষ্ঠিরও সেইভাবে আসিবেন—এ কেহ আশা করে না।

আমরা যারা ধরা পড়িয়াছিলাম, তারা সবাই এক স্বভাবের লোক ছিলাম না; আমরা ছিলাম নানা-মুনির নানামতের মত। আমাদিগকে দেখিলে সৃষ্টিকর্তার বিরাট প্রদর্শনীর একটা বড় অংশই দেখা হইয়া যাইত—এত হরেক রকম, এত বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতির সমাবেশ ছিলাম আমরা।

আমি জেলে ঢুকিলাম—যেন চুবড়ী হইতে মরা মাছ ক্রেতার থলির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। পরে জানিয়াছিলাম, আমার মত নিরীহ সবাই ছিলেন না। এই জেল-রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন অভিনেতা বিভিন্ন ভঙ্গীতে আগমন করিয়াছেন, যার যেমন রুচি আর কি। একজনের কথা বলি।

লোকটিকে বক্সাতে গিয়ে দেখি। করাচীর মুসলমান, বয়সে যুবক, নাম বুখারী। অতিশয় চঞ্চল, চঞ্চল লোকও বুদ্ধিমান হয়, এই শ্রীমান্ তার একটি নমুনা। এসবও তার চরিত্রে ধর্তব্য নয়। তার চরিত্রের আকর্ষণীয় দিকটা অন্যত্র। এমন সহানুভূতি ও দরদসম্পন্ন হৃদয় সচরাচর দেখা যায় না। তাই এই জাতীয় লোক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অপরিচিতকে আপন করিয়া নেয়।

করাচীর মুসলমান, বাংলায় কি কাজে আসিয়াছিল, তা জানে সে আর পুলিশের লোকে। আমরা শুধু জানি সেটা ত্রিশ সাল, একটা 'ওলটপালট এস্পার কি ওস্পার'-গোছের লগ্ন সেটা ভারত-

বর্ষের। আর বাংলার তো কথাই নাই—তার ভাগ্যাকাশে সেদিন সমস্ত কয়টা গ্রহই পুরারকমে কুপিত হইয়াছিল। এ হেন দিনে করাচীর মুসলমান বাংলাতে! কেনরে বাপু, গণ্ডগোল করিতে টিকিট খরচ করিয়া এতদূরে আসা কেন! মরার মত জায়গার কি ও-বালির দেশে এতই অভাব! কথা শুনিয়া শ্রীমান্ 'মৃদু মৃদু হাস্য' করিত। এখানে উল্লেখ থাকে যে, বাংলাটা বুখারী বলিতে পারিত না, কিন্তু বুঝিতে কিছু কিছু পারিত।

কলিকাতাতে পুলিশের লোক বুখারীকে সেই-খোঁজা খুঁজিয়াছে, হারাইলে গৃহস্থেরা ঝোপজঙ্গল আদাড়পাঁদাড় যেমন করিয়া খোঁজে। একটী বড় রাস্তার উপরে এই মুসলমানটী থাকিতেছে, পুলিশ খবর পাইয়া ফেলিল। পুলিশ আসিয়াছে, বাড়ী বেষ্টন করিয়াছে, বিশ্রামকারীদের মধ্যে এ সম্বাদ প্রচার হইয়া গেল।

বুখারী অতি আস্তে একটী দরজা খুলিয়া বাহির হইল। পাতলা রোগা মানুষ, ধারণা ছিল যে, পুলিশের দৃষ্টির উপর দিয়া পিছ্‌লাইয়া যাইবে এবং সরিয়া পড়িবে। রাহুর দৃষ্টি এড়ানো যায়, শনির দৃষ্টি এড়ানো যায়—এই পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে বাধ্য আছি। পীড়াপীড়ি করিলে, চাপিয়া ধরিলে এও বিশ্বাস করিতে স্বীকৃত থাকিব যে, মৃত্যুকেও ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু পুলিশের দৃষ্টিকে ফাঁকি! শুনিয়া বলিতে ইচ্ছা করে না কি—"পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?"

উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে ওস্তাদজী (দক্ষিণ কলিকাতার অমর চাটার্জী) ছিলেন, তিনি দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিয়াছিলেন—"ব্যাটা করাচীর মুসলমান এ কি তোমার দেশের পুলিশ পেয়েছ যে, ইচ্ছা হোল আর দেশ ছেড়ে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এলে? নে ব্যাটা বল্, তারপর কি হোল।"

তারপর হইল পুলিশ-দর্শন: দরজা খুলিয়া রাস্তায় দাঁড়াইতেই দেখিল যে, এ পোড়া মুল্লুকে রাতদুপুরেও অন্ধকার নাই। আলোগুলি সমান উৎসাহে সানন্দে জ্বলিতেছে। মাথার উপর

পাগড়ী আর পায়ের তলায় ছায়া লইয়া পুলিশ এদিক ওদিক ও সর্বদিকে দাঁড়াইয়া আছে। শেষে কি এই পদছায়ার শরণ নিতে হইবে!

গ্রীষ্মকাল, একপাল কুলি ও ভিখিরী কাছেই ফুটপাতের উপর শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। দেখিয়া বুখারীর নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে—"এস ভাই, তোল হাই, শুয়ে পড় চিৎ।" বুখারী ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশিয়া গেল।

এর পরের ইতিহাস অতি সহজেই অনুমেয়। মাথার উপরে লাল পাগড়ী, আর মগজের মধ্যে কালো সন্দেহ—এই তো পুলিশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পুলিশের দৃষ্টিতে জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ ইত্যাদি অনাবশ্যক আপদ-বালাই নাই। সে দৃষ্টি একেবারে মার্জিত, মুক্ত ও নিরাসক্ত;—সমস্ত পৃথিবীটাই সে দৃষ্টির নিকট একটা বড় রকম শয়তানের আড্ডা, আর মানুষগুলি সেই আড্ডায় ছোট-বড় এক একটী চেলাচামুণ্ডা। সৃষ্টি ও সমাজ সম্বন্ধে এতবড় একটা দার্শনিক দৃষ্টি পুলিশেরই সম্ভব।

সেই পুলিশ, সন্দেহ যার চোখে স্বর্গীয় জ্যোতি জ্বালাইয়াছে—বুখারী চাহিয়াছিল তাদের নাকের ডগাতেই আত্মগোপন করিতে। সে তখনও জানিত না যে, পুলিশ এমনই একটী প্রদীপ যার নীচে অন্ধকার থাকে না। কবি তো খামাকা বলেন নাই যে, "তোমার আলোয় নাই তো ছায়া।"

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই"—বলিয়া পুলিশ দেখিতে লাগিয়া গেল।

সে এক ডাকাতপড়া হৈ হৈ ব্যাপার আর কি! কুলি ও ভিক্ষুকের দল যেন জাগিয়াও স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—চোখে মুখে এমনি ভূতে-পাওয়া দৃষ্টি। কিন্তু ভূতও পালায় গুঁতার চোটে। এখানে একটা শুভ-সংবাদ দেই, যাতে প্রত্যেক দেশপ্রেমিকই আশ্বস্ত হইবেন। আমাদের দেশবাসীর প্লীহাগুলি আর আগের মত নরম নাই—অনেক মজবুত টেকসই হইয়াছে। সেদিন তাই বুটের ফুটবল-

কিক্‌গুলি পেটের উপর অমন অনায়াসে তারা পাতিয়া লইতে পারিয়াছিল।

বুখারীর প্লীহাও এই পরীক্ষায় পড়িয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাওয়া যায় নাই। সে কথা থাক্‌। ছাই উড়াইয়া দেখিতে গিয়া রত্ন মিলিয়া গেল। ফলে, 'রাধিকার মানে পুলিশের হৃদয়ে উল্লাস'—বঁধুয়া মিলালো রাস্তায়।

এইখানটায় ওস্তাদজী বুখারীকে বলিয়াছিলেন—"কেমন, দেখ্‌লি তো ব্যাটা, এ তোদের সিন্ধী পুলিশ নয়, খোদ টেগার্ট-সাহেবের পুলিশ। নে বলে যা, তারপর কি হোল। ব্যাটা হারামজাদা, আচ্ছা বুদ্ধি করেছিলে বাবা, একেবারে কুলির মধ্যে ডুব!" এবং শেষে সান্ত্বনার সুরে কহিয়াছিলেন—"নে, দুঃখ করিস্‌নে। শেষটাতো সেই ভদ্রলোকের দলেই এলি।" বলিয়া আমরা যত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলাম, তাদের উপর দিয়া দৃষ্টিটা ঝাঁটার মত মার্জনা করিয়া নিলেন।

পরের দিন পুলিশের এক বড় সাহেবের নিকট বুখারীকে হাজির করা হইল।

সাহেব চোখের কোণে দেখিয়া লইয়া কহিল—"এই সেই করাচীর পাখী! শেষটা তবে ধরা পড়লে?"

ওস্তাদজী কহিলেন—"তুই কি বল্লি? বল্লিনে কেন, প্রিয়তম, ভীরু পাখী পিঞ্জরে এসেছি; দোহাই তোমার, দ্বার কোরনা রুদ্ধ কোরনা।"

কথাটা ইংরেজী করিয়া বুঝাইয়া দিতে বুখারীও আমাদের মতই হাসিয়া উঠিল। পরে কহিল—"আহা, যদি জানতাম।"

সাহেব জানিতে চাহিল—বুখারীকে কোন্‌ শয়তানে প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, সে করাচী ছাড়িয়া এই বাংলাতে আসিয়া ঢুকিয়াছে।

বুখারী বিনীতভাবে কহিয়াছিল যে, হুজুরকে যদি শয়তানে সাতটি সমুদ্র এবং তেরটী নদী পার করিয়া এখানে আনিয়া ফেলিতে পারে, তবে দেশেরই একস্থান হইতে অন্যত্র তাকে সরাইয়া আনিতে পারা কি বেশী আশ্চর্যের বিষয়!

শুনিয়া সাহেব খুসী হইল, এবং ঘোঁৎ করিয়া একটা আওয়াজ ছাড়িল; বলিল যে,—বাংলায় যখন আসিয়াছে, বেশ, তখন তার পুরো মজাটা ভোগ করিয়া যাইতে হইবে।

এবার বুখারীর খুসী হইবার পালা। স্বর্গীয় হাসি হাসিয়া সে যাহা কহিয়াছিল, তাহার কবিতায় তর্জমা এই– 'অহো করুণা তোমার হৃদয়ে রহিবে গাঁথা।'

কয়েক মাস বক্‌সা দুর্গে কাটাইয়া অবশেষে তার মজা ভোগটা শেষ হয়। বাংলার পুলিশ তাকে বাংলার সীমানার বাহিরে রাখিয়া আপদ বিদায় করিয়া আসে। এবং বিদায় অভিনন্দনে শাসাইয়া দেয় যে, এ পাড়ায় ফের যদি সে পা দেয়, ও-ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া তবে ছাড়িবে।

বুখারী আশ্বস্ত হইয়াই ফিরিয়া গেল।

সাড়ে ছয় বৎসর আগের ব্যাপার, তবু ছবিটা পরিষ্কারই চোখের উপর আসে।

সেই সন্ধ্যায় নীচে পাঁচ-নম্বর ব্যারাকে 'খাণ্ডারবাণীর' আসর বসিয়াছে। গানের যন্ত্রপাতি সমুদায় মজুত হইয়াছে। অমর চাটার্জী তবলার সামনে জাঁকিয়া বসিয়া এবং নেড়ামাথায় কম্ফর্টার জড়াইয়া লইয়া বিড়ি ফুকিয়া চলিয়াছেন। তাকিয়া ঠেস দিয়া 'খাণ্ডারবাণী' আসরের ওস্তাদ লক্ষ্ণৌপোষাক-পরিহিত হইয়া নলিনীন্দ্র সেন বিরাজ করিতেছেন, অতি আমীরী ঢংএ আলবোলার নল মুখে টানিয়া লইয়া তিনি ধূম উদ্গীরণ করিতেছেন, সুর্মাটানাচোখ আবেশে স্তিমিত হইয়া আছে। দেখিলে সম্ভ্রম উদয় হয়—মন এক ছুটে অতীতের সেই নবাব-বাদশার সঙ্গীত-মজ্‌লিশে গিয়া প্রবেশ করিতে চাহে। ওস্তাদের পাশে তার খাস মুন্‌সী (Private Secretary) ভূপতিদা' (মজুমদার) মাথায় লক্ষ্ণৌটুপি ও গায়ে জওহরলালী-ফতুয়া পরিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। অদূরে 'খগরাজ পায় লাজ নাসিকা' লইয়া দীর্ঘকায় খাঁসাহেব (মিঃ রেজাক) হাঁটুর উপর পা তুলিয়া লইয়া মৃদু মৃদু শরীর ঢুলাইতেছেন, আর তাম্বুল চর্বণ করিতেছেন; হাতে

চুণের বোঁটাটী এমনভাবে ধৃত—যেন ছেলেদের ইতিহাস বইতে সম্রাট্ সাজাহান হাতে গোলাপ ফুল লইয়া বসিয়া আছেন। উপরের ব্যারাক হইতে প্রায় সকলেই নীচে আসিয়া পড়িয়াছেন। সভার মধ্যে একধারে ক্ষীণকায় মধুদা' (সুরেন ঘোষ) ওষ্ঠে অস্ফুট হাসি নিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। তারই পাশে সুদর্শন প্রতুলবাবু (গাঙ্গুলী) চোখে শিশুদের কৌতূহল নিয়া একবার এটা আর একবার ওটার উপর চক্ষুকে ঘুরাইয়া নিয়া ফিরিতেছেন, আর মাঝে মাঝে সুরেনবাবুর সঙ্গে চুপে চুপে বাক্য-বিনিময় করিতেছেন। সভার মাঝখানে বিপুল-দেহ মাস্টার মহাশয় (যতীন ঘোষ) কাঁচাপাকা মাথা নিয়া বেশ পোক্ত হইয়া বসিয়াছেন, ভাবখানা এই যে—কিছুই আজ ফস্‌কাইতে পারিবে না, সতরঞ্চি উঠান ইস্তক দেখিয়া তবে ঘরে ফিরিবেন। তারই প্রায় কাছে ততোধিক বিপুল দেহ লইয়া রবিবাবু (সেন) প্রতিষ্ঠিত আছেন; তাঁর ভাবখানা এই যে—ইহারা এখনও কেন আরম্ভ করিতেছে না, আর দুমিনিট ধৈর্য ধরিয়া দেখিব, তারপর সব লন্ডভন্ড করিয়া ছড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইব।

সবাই প্রায় আসিয়া গিয়াছেন, এখন আরম্ভ করিলেই হয়।

অবলাদা' (কর) অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন- "ও মহেন্দর (গায়ক ব্যানার্জী) আর দেরী কর ক্যান্?"

মহেন্দর উত্তর দিবার আগে এক কোণা হইতে শোনা গেল কে বলিতেছেন—"বিলম্বের আর দেরী কত?"

সেই কোণা হইতেই উত্তর আসিল—"ব্যস্ত হন ক্যান্? আরম্ভ করলেই শুরু হবে।"

এমন সময় রঙ্গীন-পোষাক-পরিহিতা, অলঙ্কার-ভূষিতা, জরীর নাগরা পায়, ওড়না গায় রূপসী বাইজী আসরে আসিলেন। সঙ্গীত-সম্প্রদায় সবাই উঠিয়া আসিয়া আ-ভূমি কুর্নিশ করিয়া দুইহাত বারম্বার কপালে ঠুকিয়া বাইজীকে অভ্যর্থনা করিল। বাইজী পায়ের ঘুঙুর বাজাইয়া আসরের মধ্যখানে আসন গ্রহণ করিলেন।

ওস্তাদজী আলবোলার নল ফেলিয়া অর্ধোত্থিতভাবে দুই হাত সামনে বাড়াইয়া দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন—"আইয়ে বিবিসাব।"

সভার মধ্যে একটা আন্দোলন বহিয়া গেল। দেব-সভায় উর্বশী যেন নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিলেন। আমরা সকলেই নিজেদের এক একটী দেবতার ন্যায় বোধ করিতে লাগিলাম। আনন্দের অমৃত যেন কলস উপুড় করিয়া পান করিয়া লইয়াছি, এবম্প্রকার নেশা ও উত্তেজনা আমাদের প্রত্যেককেই আসিয়া আক্রমণ করিল।

বুখারীকে বাইজী পোষাকে মানাইয়াছিল---স্বীকার করিতে হইল। গানের ফাঁকে ফাঁকে বাইজী উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন কয়েক পাক নাচিত—তখন আমাদের হৃদয়গুলি ঢেউ-খাওয়া নদীর মত আথালি-পাথালি করিতে ভুলিত না। সবচেয়ে বিষম হইত যখন বাইজী বিশেষ বিশেষ পাত্র বাছিয়া অপাঙ্গ হইতে নয়ন-বাণ নিক্ষেপ করিত।

আমি কয়েকবার তার আঁখির প্রসাদ পাইলাম। তাতে অনেকে ঈর্ষায় কাতর ও বিষে নীল হইল, তাদের দৃষ্টি ভীমরুলের হুলের মত ঝাঁকে ঝাঁকে আমার উপর আসিয়া পড়িল। আমি নিজের সৌভাগ্যে গর্বিতবোধ করিলাম এবং এদিকে আমার কর্ণমূলও ঘন ঘন আরক্ত হইতে কোন ত্রুটি করিল না। বাইজীর সে দৃষ্টি আজও মনে আছে। লিখিতে সাধ যায়।—"সেই দৃষ্টিখানি, কেমন করিয়া বলিব সেই দৃষ্টিখানি।" সন্ন্যাসীর তৃতীয় নয়ন দগ্ধ করিতেই শিখিয়াছিল, এ-রকম বিঁধিতে শেখে নাই। ভস্ম-হওয়া মদন আর বাণ-বিদ্ধ হরিণ, মানে এই যেমন আমরা--এর মধ্যে কার অবস্থা বেশী কাহিল ভাবিতেছি।

এদিকে দেব-সভায় আবার আনন্দধ্বনি ও হাসি উঠিল, বাইজী বোধ হয় হাসির শান দেওয়া মৃদু সঙ্কেতময় দৃষ্টি কোন ভাগ্যবানের উপর নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন।

কাতর হইয়া কে কহিলেন—"সখি, অমন তেরছ নয়নে চেওনা।" অমর চাটার্জী তবলার উপর হাত চালাইতে চালাইতে বাইজীর দিকে একটু ঝুঁকিয়া কহিলেন—"ও হারামজাদা তোমার এতও আসে!"

কে একজন সংশোধন করিল—"হারামজাদা নয়, হারামজাদী।"

বাইজী হারামজাদী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিভ বাহির করিয়া ভেংচি কাটিল। সুন্দরীর ভেংচি—দেখিয়া আমরা কেহই হাস্যসংবরণ করিলাম না।

সে-দিন হইতে সাড়ে ছয় বছর সরিয়া আসিয়াছি, রোজই আরও দূরে সরিয়া যাইতেছি। কিন্তু বক্সাদুর্গের বন্দী-দিবসের এই সুখ-স্মৃতি হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারিতেছি না—তাহা ছায়ার মতই মনের নিত্য-অনুগামী হইয়া চলিয়াছে।

দূর করাচী হইতে লোকটী বাংলায় আসিয়া ধরা পড়িল, আমাদের সঙ্গে কিছুকাল সুখ-দুঃখে কাটাইয়া দেশে ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় যে সে এ-দেশে এতগুলি মনে একটা স্থায়ী স্মৃতি রাখিয়া গেল—তা বোধ হয় সে-ও জানিতে পারে নাই।

আজ জেলের গরাদ-দেওয়া জানালা দিয়া রাত্রির আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি, কাকে যেন ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—"কত অজানারে জানাইলে তুমি।"

ডাক্তার গুরুগোবিন্দ সম্বন্ধে এ-গল্পটি প্রচলিত।

ডাক্তারকেও প্রথম দেখি বক্সা কেল্লাতে। তার বিশেষত্ব তার কদমফুলী কেশ—মাথার উপর যেন সজারু-ক্ষেত বোনা হইয়াছে। তাকে চিরুণী চালাইতে দেখিয়া কে নাকি গাহিয়াছিল—"কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা।" ডাক্তারও হাসিয়া কহিয়াছিল—"ঠিক কইছরে ভাই, এ চিরুণী ফিরুণীর কম্ম নয়, রীতিমত মই দেয়া দরকার।" ডাক্তারের দ্বিতীয় বিশেষত্ব তার মুখের একটি টানিয়া টানিয়া বলা বুলি—যেটি কোন ঘটনাস্থলে প্রবেশের মুখে সে ব্যবহার করিত—"কাজ্যাডা কিরে মশায়!" ডাক্তারের সর্বত্র—"ইয়েস-এ্যাডমিশন"। সকলের সঙ্গে মিশিবার সহজ শক্তি তার। এটা অর্জিত গুণ নয়, নিয়াই জন্মিয়াছে। ভাগ্য বলবান—তাই শত্রু জয় করিবার হাঙ্গামা তার নাই, কারণ তার শত্রু নাই বলিলেই হয়।

এই গুরুগোবিন্দ ডাক্তার যখন টের পাইল যে, পুলিশে বাড়ী বেষ্টন করিয়াছে, তখন 'শ্রীঊষা—ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা।' গুরু-গোবিন্দ বাসা ছাড়িবার মতলব করিল।

এ কলিকাতার বাড়ী নয় যে, নিজের ব্যূহেই অভিমন্যু হইতে হইবে। এর সব দিক দিয়াই নির্গমন চলিতে পারে। পলায়নে পায়খানার পথও প্রশস্ত, আপদ্ধর্মে লিখিত আছে। বাহির হইতে শ্রীঊষার আলোতে দেখা গেল তত্রস্থানেও এক পুলিশ, ব্যূহের নির্গমন-পথ আটকাইয়া দণ্ডায়মান। কানামাছি-ভোঁ করিয়া ডাক্তার দৌড় দিল।

সিপাহী প্রস্তুত ছিল না, ব্যাপারটা মালুম হইল একটু দেরীতে। তখন কাঁধের উপর চার-হাতি বাঁশের লাঠি তুলিয়া লইল। তারপর 'শালা ডাকু' বলিয়া মারণ-মন্ত্র হাঁকিয়া পশ্চাদ্ধাবন করিল। অগ্রে ধাইতেছে 'শালা ডাকু' ডাক্তার গোবিন্দ—পশ্চাতে ধাইতেছে বংশ কাঁধে ধ্বংস সিং। ছবিখানা মনে মনে দেখিয়া লইয়া সুরপতি চক্রবর্তী নাকি বলিয়াছিল—"এ যে দেখ্‌ছি, আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী।"

বেশীদূর যাইতে হইল না। সামনেই পাটের ক্ষেত। প্রবেশ-মুখ বুকসমান উঁচু বাঁশ দিয়া বন্ধ। গতি রুদ্ধ হইল। ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়া পাটের ঘন অরণ্যে অজ্ঞাতবাস করিবার সাধ হইল; কিন্তু আগে দেখিয়া নেওয়া দরকার পুলিশটা কতদূর রহিয়াছে, ব্যাটা যা দৌড়াইতে পারে—যেন রেসের ঘোড়া। ঘাড় ফিরাইতেই গুরুগোবিন্দ মজুমদার দেখিল যে, ধ্বংস সিংহ সিংহ-বিক্রমে মাথা তাক্ করিয়া লাঠি উঠাইয়াছে। মুখে তার মন্ত্র হাঁকিত হইতেছে—"শালা, ভাগ্‌তা হ্যায়।"

লাঠি মাথায় পড়িল বলিয়া। সত্যই মাথায় লাঠি মারিবে নাকি। ব্যাটাদের বিশ্বাস নাই। মাথা বাঁচানো আশু কর্তব্য হইল—পাটক্ষেতে প্রবেশের কথা পরে ভাবিলেও চলিবে। অতএব ডাক্তার গুরুগোবিন্দ রুখিয়া দাঁড়াইল, দাঁত-মুখে খিঁচুনী দিয়া কহিল—"হাম কি ডাকু হ্যায় না চোর হ্যায় যে তুমি লাঠি উঠাতা হ্যায়?"

লাঠি নামাইয়া পুলিশটি কহিল—"বাবু, তবে এমনভাবে দৌড় দিলে কেন?"

—"তোমার বুদ্ধিভিতো বহুৎ দেখছি। দৌড় দিলেই যদি চোর আর ডাকু হোতা হ্যায়, তবে খেলার মাঠমে দলে দলে চোর ডাকু দৌড়াতা হ্যায়, লাঠি লেকর ওধার যাওনা কেন বাপু!"

পুলিশ নাছোড়বান্দা, হটিতে চাহে না। কহিল—রাস্তাটা খেলার মাঠ নহে, আর বাবু যে খেলিতে বাহির হইয়াছেন, তেমন তো বোধ হইল না।

গুরুগোবিন্দ সুর ঢিলা করিয়া লইয়া করুণ পর্দায় আনিল। কহিল—"দেখ সিপাইজী, পায়খানাকোবাস্তে দৌড় দিয়া।"

সিপাইজী কি দেখিল সেই জানে, কিন্তু চোখদুটা তার কপালে ঠেলিয়া তুলিল। পরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিল—নিজের বাড়ীর পায়খানা ছাড়িয়া এমনভাবে দৌড়াইয়া হয়রাণ হইবার আবশ্যকতা কি ছিল, খামাকা কষ্ট পাওয়া হইল।

—"বহুত বেগ হুয়া থা, তাই একটু ভুল হো গিয়া। চল্ বাবা, ফিরেই যাই। এ নিয়ে আর ডিবেট করে লাভ নেই।"

—"চলিয়ে বাবু।"

যে-রাস্তা দিয়া আসিয়াছিল, আবার সেই রাস্তায় ডাক্তার ফিরিয়া চলিল।

ডাক্তার গোবিন্দ সেই হইতে ক্ষেতের মুখে বাঁশের বেড়া দেওয়ার ভয়ানক বিরুদ্ধে। ছাগল-গরু আটকাইবার ছলে কৃষক ব্যাটারা বেশ ফন্দি করিয়াছে, মানুষকে পর্যন্ত আটকাইয়া দিল। পশু-পর্যায়ে পড়িয়া গিয়া ডাক্তার গোবিন্দ অবরুদ্ধ পশুর মতই আক্রোশে ভিতরে ভিতরে সেদিন গুমরাইয়াছিল।

ডাক্তার বলে—"হয় বাঁশ দিয়া ক্ষেতের বেড়া দেও, নয় পুলিশের লাঠি কর। দুটোর একটা কর—নইলে যে দেশে টেকা দায়। বাঁশ দিয়া সমুখ পিছন দুদিকেই আক্রমণ—কাঁহাতক সহ্য করা যায়।" আইন-সভার দৃষ্টি যাতে এ দিকে আকৃষ্ট হয়—খালাস পাইলে সে চেষ্টা

করাই ডাক্তার গোবিন্দের প্রথম কর্তব্য হইবে, আমাদের সে তা স্পষ্ট-ভাবেই জানাইয়া দিল। স্বদেশী-ফদেশীর কথা পরে হইবে।

ডাক্তারকে কে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"ডাক্তারবাবু, ব্যাপারটা তা হোলে সত্য!"

কিছুক্ষণ দৃষ্টি দিয়া বক্তাকে বিদ্ধ করিয়া পরে ডাক্তার গম্ভীর গলায় চিবাইয়া চিবাইয়া কহিল—"কেন, বাঁশ বিশ্বেস করেন না বুঝি? খুব নাস্তিক হোয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। বাঁশ না গেলে আপনাদের বিশ্বাস হবে না"—বলিয়া ডাক্তার উপস্থিত সকলের উপর চোখ ঘুরাইয়া লইয়া দম ছাড়িল, এবং শান্ত ও তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিল।

আর একজনের ধরা-পড়ার কথা বলি।

এ গল্পের যিনি নায়ক, নামে চেহারায় কোনটাতেই তিনি আমার পরিচিত নন। যেমন শুনিয়াছি, তেমনই লিখিলাম। গল্প সত্য কি মিথ্যা, তা আমি জানি না। শুধু জানি—এই জাতীয় গল্প ক্যাম্পে এত চল্‌তি ছিল যে, তা সত্যের মতই সম্মান পাইয়াছে। মিথ্যা হইলেও এরা আমাদের বন্দি-জীবনে যে রস যোগাইয়াছে, তা সত্য ঘটনাতেও সরবরাহ করিতে পারে নাই। যা ঘটে, তাই শুধু সত্য নয়। মানুষের কল্পনায় ও কামনায় যাহা ঘটিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে, অথচ ঘটে না, তাহাও কম সত্য নহে। হয়তো জীবনের অন্তর-ইতিহাসের দিক দিয়া তাহারাই বেশী মূল্যবান ও সত্য। মোট কথা, যে-গল্পটি এখন বলিব, তাহা সত্য কি মিথ্যা, সে ভাবনা আমার নয়। আমি আর দশজনের মত ইহা শুনিয়াছি, আরাম উপভোগ করিয়াছি এবং এই দীর্ঘদিনেও তাহা ভুলি নাই। অথচ জেলের সত্য অত্যাচার-গুলি এতদিনে বেশ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে, জোর করিয়া তাদের মনে করিতে হয়।

ভদ্রলোকটি কলিকাতাতেই ধৃত হন। তাঁকে আই-বি অফিসের এক বড় কর্মচারীর সম্মুখে হাজির করা হয়। সঙ্গে ছিল এক পুলিশ

ইনস্পেক্টর যিনি তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া আনেন। অফিসার চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—"বসুন।"

ভদ্রলোক বসিলেন।

অফিসার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নাম?"

ভদ্রলোক সবে মাত্র বসিয়াছিলেন, প্রশ্নটা শুনিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পার্শ্ববর্তী ইনস্পেক্টরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কেমন দেখলেন তো? কতবার আপনাকে বললুম, মশায় আমি সে লোক নয়। তবু নিয়ে এলেন?"

তারপর অফিসারকে বলিলেন—"স্যার, তখনই ওঁকে বলেছিলুম। জিজ্ঞেস করে দেখুন, বলেছিলুম কিনা। উনিও আমার নাম জানেন না, আর আপনিও জানেন না। অথচ আমাকে টেনে নিয়ে এলেন। স্পষ্টই বুঝতে পারছি, কোথাও একটা মস্ত ভুল হয়েছে, আমাকে নিয়ে মিছিমিছি এ টানাটানি। কতবার বল্লাম, আমি সে-লোক নয়, তবু—না, যেতে হবে আপনাকে।"

ভদ্রলোক ঘুরিয়া আবার ইনস্পেক্টরকে বলিতে লাগিলেন—"আপনার ধারণা, পুলিশের ভুল হতে পারে না, আর আমরা ভদ্রলোকের ছেলেরা সত্য কথা বলি না।" পুনরায় অফিসারের দিকে আবর্তন—"স্যার, আমাকে তবে পাঠিয়ে দিন, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।"

অফিসার বলিলেন—"দিচ্ছি, বসুন। ইনস্পেক্টরকে কহিলেন, দেখুন তো গাড়ী আছে কিনা!"

গাড়ী আছে কিনা দেখিতে ইনস্পেক্টর বাহির হইয়া গেলেন। অফিসার আপন কাজে মগ্ন হইলেন। ভদ্রলোকটিকে 'বসুন' এবং 'আপনার নাম কি' এ দুটি কথা ছাড়া এতক্ষণ কথা বলিবার অবকাশ অফিসার বা তাঁহার ইনস্পেক্টর কেহই পান নাই। ভদ্রলোককে সামনে বসাইয়া রাখিয়াই তিনি নিজের কাজ করিতে লাগিলেন।

ভদ্রলোকটি অফিসারকে কহিলেন—"স্যার, যা ভয় পেয়েছিলুম! বুঝতেই পারেন, একে দিনকাল মোটেই ভালো না, তার উপর

পুলিশের হাঙ্গামা, কত বড় শক্ত নার্ভের দরকার,—তা স্যার আপনাকে আর কি বুঝাব। বলিয়া হয়তো আরও কিছু বুঝাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় ইনস্পেক্টর ঘরে ঢুকিয়া জানাইল যে গাড়ী আছে।

অফিসার কহিলেন—"এঁকে তবে পেঁছে দেবার বন্দোবস্ত করুন। আর সেলে যে-দুজন আছে, তাদেরও নিয়ে যাবেন। আচ্ছা, আপনি তবে আসুন!"

"নমস্কার"—বলিয়া সানন্দে ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ইনস্পেক্টরের সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিলেন। কিন্তু সেই গাড়ী তাঁকে ও সেলে যে-দুজন আছে তাদের নিয়া আসিয়া থামিল প্রেসিডেন্সি-জেল-গেটের সামনে। ভদ্রলোক ঝাঁকের কইয়ের মত ঝাঁকে মিশিয়া গেলেন।

তাঁকে একজন বলিয়াছিল—"ফাঁকি দিতে পারলেন না তবে?" —"কোথায় শুনেছেন থিয়েটারে পুলিশ ভোলে? শাস্ত্রেই আছে, পাষাণে কাঁদা নাই। পুলিশকে চিনতে আপনাদের ঢের বাকী আছে। বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মকে চেনা যায়, কিন্তু মর্তের এই সগুণ জীবটির সীমা শেষ করা—সে নৈব নৈবচ।"

জীবনের রঙ্গ-মঞ্চে যে কত রকম অভিনয় চলিতেছে, তা ভুলিয়া থাকি। এই রকম দুই একটি লোকের কথাবার্তায় ও ব্যবহারে চেতনা সে-দিক আকৃষ্ট হয়। তখন চোখের উপর হইতে পর্দা সরিয়া যায়, দেখিতে পাই যে বিরাট নাট্যশালায় আমরা সবাই অভিনেতা। কিন্তু নাট্যকারটি কে—তাহা কেহ বলিতে পারে কি?

আমি ও আমার মত যারা নিরীহ, শুধু তাদেরই জেলখানায়-প্রবেশ বিশেষত্বহীন। এই বিশেষত্বহীনদের বাদ দিলে যা থাকে, তাও সংখ্যায় নেহাৎ কম হইবে না। এরা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর কীর্তিমান। এদের জীবন আর দশজন বাঙগালীর মত ঢিমা-তালে বহে না, ঘটনা হইতে ঘটনায়,—তা ছোটই হউক বা বড়ই হউক, লম্ফ দিয়া বিষম চালে চলে।

এদের জীবন দেখিতে ছোট হইলেও আসলে তাহা ইতিহাস জাতীয়। পৃথিবীতে ছোট নদীও আছে। জল থাকিতেও সরোবর-দীঘি-বিল তার আত্মীয় নয়, গঙ্গা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের শোণিতই তার স্রোতে। ডোবা, পুকুর, দীঘি ইত্যাদির মত নিজ পাড়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া শান্ত স্বপ্নে দিন-যাপন এর রক্তে নাই। পাড়ায় দুরন্ত ছেলে-গুলি যখন স্নান করিতে সাঁতার কাটিতে নামে তখনই যা একটু অশান্তি বদ্ধ জলাশয়গুলিতে দেখা দেয়—ছোট ছোট ঢেউগুলি ভাঙিগতে ভাঙিগতে তীর ছুঁইবার আগেই মিলাইয়া যায়। এ ব্যতীত সেখানকার শান্তিতে কোন বিঘ্ন কখনও দেখা দেয় না। আর নদীতে —হউক না কেন সে ছোট নদী, যখন উত্তরে পাহাড়ের মাথায় বরফ গলিতে আরম্ভ হয়, তখনই এই নদীর ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। তারপর পাহাড়ের জলকে সমুদ্রে বহিয়া নিবার জন্য দিনরাত্র কী তার উন্মত্ততা ও প্রচণ্ডতা। তীর প্লাবিত করিয়া জলকে দিকে দিকে পাঠাইয়া দেয়—খাল-বিল-মাঠ ভরাইয়া ফেলে, এবং ফেনা ও ঘূর্ণাবর্ত লইয়া যুদ্ধের ঘোড়ার মত সে ছুটিয়া চলে। গ্রামের বৌ-ঝিরা স্নান সারিতে ও জল ভরিতে আসিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া চোখ মেলিয়া নদীটিকে দেখিয়া লয়, ভাবে—তাদের সেই পরিচিত শান্ত ছোট নদীটি এমন হইল কেন! কোথায় সুদূরে এর রক্তের যোগ রহিয়াছে—তাই আজ আর একে আপন ও আত্মীয় বলিয়া ধরা যাইতেছে না। নিশ্চয় রক্তে এর কোন অভিশাপ আছে, তাই এমন ক্ষিপ্ত ও ভয়াবহ আকার এর হইতে পারিয়াছে। তারপর স্নান সারিয়া ঘট ভরিয়া স্রোতের জল

লইয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। কিন্তু কলসের মধ্যে যে-স্রোতটুকু ভরিয়া লইয়া যায়, তাও শান্ত থাকিতে চায় না, প্রতি পায়ে উছলাইয়া পড়িতে থাকে, সুযোগ পাইলেই ঘরের মেঝেতে গড়াইয়া ছোট ছোট ধারায় আঁকাবাঁকা শিশু-স্বপ্নগুলিকে স্রোতে ভাসায়। নদী ছোট বটে, কিন্তু সে যে মহানদীগুলিরই স্তন্যপুষ্ট সন্তান -তা ভুলিতে দেয় না! নদী সে—সে পুকুর-দীঘির আত্মীয় নয়।

এই সাত বছরে আমরা ধরা পড়িয়াছি ভিন দেশের মত। দরিদ্র বাংলার মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমরা। অভাব-অনটনের মধ্যেই আমাদের জন্ম—মৃত্যু পর্যন্ত সে-দারিদ্র্য আমাদের ছায়ার মতই নিত্যসহচর। স্বাস্থ্যে আমরা ভারতের অন্য প্রদেশগুলির তুলনায় কত ক্ষীণ-সম্বল। সীমান্তের পাঠান, মরুভূমির রাজপুত, পাঞ্জাবের শিখ—এদের পাশে দাঁড়াইতে আমরা সঙ্কোচ ও লজ্জাবোধ করি। মনে হয়, এই সংঘর্ষের পৃথিবীতে আমরা যেন বিধাতার পরিহাসের মতই আসিয়াছি। স্বাস্থ্য ও শরীরকে আশ্রয় করিয়া যে-প্রাণ আগুনের মত জ্বলিতে থাকে, তার কোন রক্তাভাই তো আমাদের দেহে প্রতিফলিত হয় না। একটা পাঠান বাচ্চাকে দেখিলে মনে হয়, বন্য পশুর প্রাণ-শক্তি এর শরীরে আটকা পড়িয়া ছটফট করিতেছে, দেহের সীমায় আর বুঝি এ প্রবল প্রাণ-বন্যাকে ধরিয়া রাখা যাইবে না। কিন্তু আমাদের দিকে চাহিলে ও-রকম কোন কথা মনে হইবার হেতু থাকে না—এই দুর্বল রোগা শরীরের মধ্যে কোথায় প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতেছে, তা যন্ত্র দিয়া আবিষ্কার করিতে হয়।

অথচ এই বাঙ্গালী নিজেকে আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ অধিবাসী বলিয়া জানে, অন্যান্য প্রদেশও তাহা বিনা আপত্তিতে মানিয়া নেয়। এর কারণ কি হইতে পারে, এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি কিসের জোরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তাহা আজ বুঝিতে পারিয়াছি। অন্য প্রদেশের সন্তানেরা প্রাণ নিয়াই জন্ম লয়, যেমন প্রাণ-জগতের অন্যত্রও দেখা যায়। প্রাণ-প্রাচুর্যে পশুকে পর্যন্ত পরাস্ত করিতে এরা পারে। কিন্তু জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এদের বারো-আনারও উপরের অংশ নাবালক থাকিয়া যায়। প্রাণের

পাথেয় জীবন-পথে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু মানুষের অর্থ তাতে প্রতিষ্ঠিত হয় না। নূতন তীর্থে বা বন্দরে পেঁৗছিবার জন্য প্রাণ শুধু রসদ মাত্র।

এইখানেই আমরা অপরাপর প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র। তারা যেমন প্রাণ নিয়া জন্মগ্রহণ করে, আমরা তেমনি জন্ম লইবার সময় মন নিয়া আসি। মনের সম্বলেই আমরা এদের চেয়ে ধনী ও অন্যজাতের হইয়া পড়িয়াছি। প্রাণ দিয়া সৃষ্টিতে প্রাণী টিকিয়া থাকে, আর মন দিয়া মানুষ সৃষ্টির ঘোমটা খুলিয়া তার রহস্যের মুখোমুখী দাঁড়ায়। প্রাণ বাহন—মন সে-বাহনের সোয়ার। কোন দুর্গের দুয়ারে সে থামিবে এবং কোন বন্দিনীকে উদ্ধার করিয়া লইবে—মানুষের জীবন-নাট্যের এই তো সংক্ষিপ্ত অথচ ক্রমবর্ধমান ইতিহাস। সৃষ্টিতে প্রাণের প্রয়োজন পরিত্যক্ত হইতে পারে কিনা—এই অসম্ভব স্বপ্ন নিয়াই মন আসিয়াছে, এবং প্রাণের উপর চাপিয়া বসিয়াছে।

এই জোরেই ভারতের রঙ্গমঞ্চে আমরা নায়কের সহজাত অধিকার লইয়া আসিয়াছি। আমরা ক্ষীণকায় বাঙ্গালী সত্য। আমরা নিরীহ, আমরা ভেতো—সবই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে আপত্তি করিব না। কিন্তু মরিয়া গেলেও, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন'—এ-কথা মুখ দিয়া বাহির হইবে না। বাঙ্গালী মরুক,—কত জাতিই স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া গেছে, কিন্তু সে যেন আত্মহত্যা না করে।

আমার এ-মনোবৃত্তির কারণ, আমি এই দীর্ঘদিন জেল-জীবনে যাদের দেখিয়াছি, যাদের সঙ্গে একত্র রহিয়াছি—তাহারা। তাহাদের সান্নিধ্যে যে-অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে—তাতেই আমার এ-গর্ব দিনে দিনে পুষ্ট হইয়াছে।

আজ একেলা জেলের জানালায় লোহার গরাদের উপর পা দুটা তুলিয়া লইয়া চেয়ার পাতিয়া বসিয়া আছি। আষাঢ়ের আকাশ মেঘে-ঢাকা রহিয়াছে। নীচে পৃথিবীতে এ দুপুরেও ছায়া নামিয়াছে। বাহিরের আকাশের দিকে দৃষ্টি আমার বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আর আমি একাকী এখানে সঙ্কীর্ণ কোণে পড়িয়া রহিয়াছি। আমার মন

আজ স্বপ্ন-লোকে প্রবেশ করিয়াছে। মেঘের আড়ালে দিনের সূর্যকে দেখা যায় না। আজিকার বাঙ্গালীর উপরে বর্তমানের ও প্রাত্যহিকতার যে-ছায়া-আস্তরণ পড়িয়াছে, তার আড়ালে বাঙ্গালীকে আমি দেখিয়াছি। এ-দেখা আমার মিথ্যা নয়—হইতে পারে না। জানি না, জেল হইতে বাহির কোনদিন হইব কিনা। কিম্বা হইলে সে কবে এবং কি অবস্থায় বাহির হইব, তাও জানি না। কিন্তু যে-সত্য আমি জানিয়াছি, তাহা এখানে লিখিয়া গেলাম। সত্যই আমি স্বপ্নে ডুবিয়া যাই নাই। আষাঢ়ের ছায়ান্ধকারে বসিয়া আমি নিজেকে প্রভুশাপে-অভিশপ্ত নির্বাসিত মনে করিতেছি না। সৌন্দর্যের স্বপ্ন-আলয়ের দিকে আমার মন নভোচারী মেঘের মত বাহির হয় নাই। আমি স্বপ্ন-সাধক নহি। আমার মন আজ ধ্যান-মুগ্ধ—দৃষ্টির উপর হইতে আজ কিছুক্ষণের জন্য আবরণ সরিয়া গিয়াছে। বিশ্বাস করিও সত্য বলিতেছি। দৃষ্টির আচ্ছাদন সরিয়া যায়—দৃষ্টি মুক্ত হয়। যত অল্প সময়ের জন্যই হউক না কেন, অসীমের স্পর্শ তাতে লাগে, এবং সত্যকে দেখিয়া লওয়া যায়। জীবন আমার যেখানে যে-ভাবে শেষ হউক না কেন, আমি নিঃসঙ্কোচে বলিয়া গেলাম—মানুষের, সমাজের ও সভ্যতার নূতন অর্থ ও রূপ দিবার দুরূহ দায়িত্ব এই বাঙ্গালীর। মহান অধিকার নিয়া সে আসিয়াছে। আমার এ-কথা মিথ্যা হইবার নহে এবং মিথ্যা হইবে না। আমি সত্যকে দেখিয়াছি।

*   *   *   *

যত লোক ধরা পড়িয়াছে, তাদের সবার খবর জানি না, যাদেরও জানি তা-ও সব লেখা সম্ভব নহে। অনেক জিনিস আছে যা স্বভাবতই গোপন। প্রকাশ্যে টানিয়া আনিলে তা কদর্য ও বিকৃত হয়। আমার বহুদিনের বিশ্বাস, মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-স্নেহ-দয়া ইত্যাদি জিনিসগুলি এই জাতীয় বস্তু। ভাষায় এদের প্রকাশ দেওয়া রুচিবিগর্হিত। পূজারী যেমন সঙ্গোপনে পূজা করে এবং পূজার ভাবটি যেমন তার সারাদিনের কাজের উপর একটি পবিত্র ছায়া বিস্তার করে, হৃদয়ের প্রীতি-শ্রদ্ধাদিও নীরবে কার্যে ও ব্যবহারে

তেমনি একটি অশরীরী আলোকপাত করিবে—তবে এর সত্য প্রকাশ হয়।

আর এক জাতীয় জিনিস আছে—যা স্বভাবতঃ গোপন নয়, যা মন হইতে মনে দেহহীন পা ফেলিয়া যাতায়াত করার ক্ষমতা ও স্বভাব পায় নাই। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এমনি একটি কঠিন সশস্ত্র নিষেধ ও শাসন রহিয়াছে, যার ফলে যা প্রকাশযোগ্য তা প্রকাশ পাইতে পারে না। সমাজ যে এইভাবে কত সত্য-ভাষণের মুখে পাথর চাপা দিয়া রাখিয়া নিজের কত বড় ক্ষতি করিয়াছে, তা তার হুঁশ নাই। তাই অকপট সত্যভাষণ হইতে সমাজ বঞ্চিত হইয়াছে। উজ্জ্বল, নির্মল ও শক্তিমান ভাষায় নিজের ছবি ও স্বপ্ন সে দেখিতে পারিতেছে না। তীক্ষ্ন, নির্মম ও কঠোর আঘাত দিয়া যে-কণ্ঠ সমাজের মধ্য হইতে ভীরু কলুষিত মিথ্যা-ভাষণ ও চিন্তাকে মার্জিত করিয়া দিবে নিজের সে-কণ্ঠ নিজ দোষেই সমাজ অবরুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। এর মধ্যেও সমাজের সৌভাগ্যের মত মাঝে মাঝে মানুষ আসে, যারা স্পর্ধিত নয় —যারা তেজস্বী, যাদের ভয় নাই। তাদের কণ্ঠে সত্য নিজ শঙ্খ অকস্মাৎ খুঁজিয়া পায়। কিন্তু সত্য যাকে বাছিয়া নিয়া আশ্রয় করে, তাকে এ-জন্য ভয়াবহ দাম দিতে হয়। ঈশ্বরের পুত্রকেও আমরা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছি। সত্যকে পরীক্ষা করার অন্য কোন উপায় এখনও আমরা পাই নাই।

তাই যা জানি, তা সব বলা সম্ভব হয় না,—আর তা বলিবার শক্তিও অর্জন করি নাই। যা সব চেয়ে প্রকাশযোগ্য ছিল, তা আড়ালেই থাকিয়া গেল। শক্তিমান সাধক যদি কেহ আসেন, এদের প্রকাশে পথ তিনিই দেখাইয়া আনিবেন। আমি আমার স্মৃতির হালকা পথ ধরিয়াই চলিলাম।

বক্সাতে গিয়া কিরণদাকে (মুখার্জী) পাই নাই, তিনি পরে আসেন। তাঁর চেনা-অচেনা সবাই তাঁর ভাইটি-শ্রেণীর ছিল। অবশ্য দু-একজন সম্মানজনক ব্যতিক্রমও ছিলেন। ভাইটিরা, বিশেষ করিয়া তাঁর বয়স্ক ভাইটিরা, কিরণদা' সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা যা-কিছু বলিবার

ও রটাইবার সুযোগ পাইলে তা ছাঁড়তে বড়ই কষ্ট বোধ করিতেন—অর্থাৎ কিরণদা' সবারই আক্রমণের পাত্র ছিলেন। পিতামহ-ভীষ্মের মত তিনি তাঁর শাসন ও আক্রমণের স্নেহ কুরু-পাণ্ডব সবাইকে সমানভাবে বণ্টন করিতেন। এ-বিষয়ে দল-বেদল—এ ভেদনীতি কিরণদা'র ছিল না। এ-রকমও দেখা যাইত যে, কিরণদা' তাঁর বয়স্ক ভাইটিদের পর্যন্ত লাঠি নিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া তাড়া করিয়াছেন। পলাতক ব্যক্তি অবশ্য তাঁর প্রাপ্তির সীমানার মধ্যেই থাকিতেন। ভাবখানা এই—গতিতে কিরণদা'কে হটানো কি যে সে কম্ম। বাঁকা হাতের শাস্তি না পাইলে বুঝিতে হইবে কিরণদা'র স্নেহের চাপরাশ তখনও অপরাধীর ভাগ্যে জুটে নাই।

কিরণদা'কে আলোচনার ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া যখনই বলা যাইত —"কিরণদা' আপনি কি বলেন?" তিনি উত্তর করিতেন—"এ-বিষয়ে মতামত না দেওয়াই ভালো।"

'মতামত না দেওয়াই ভালো'—এ-কথাটী এক সময়ে বকসাতে আমাদের মধ্যে খুব চলতি হইয়া গিয়াছিল এবং এই বাক্যটী যে কতবার কত সিরীয়স আবহাওয়ায় উচ্চারিত হইয়া আমাদিগকে সহজ ও সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে সাহায্য করিয়াছে, তা ভাবিতে গিয়া আশ্চর্য হই।

কিরণদা'র কম্বলের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্যারাকের বারান্দায় কম্বল ইত্যাদি দিয়া তিনি একটী ঘরের মত করিয়া লইয়াছেন। দিবাভাগে এখানেই পড়াশুনা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ তিনি করিতেন—শুধু শয়ন-কার্যটির জন্য ভিতরে যাইতেন।

দেখিলাম, অনেকেই উপস্থিত আছেন, এবং দেখিয়া বুঝিলাম কিরণদা'কে ইহারা কাহিল করিয়া তুলিয়াছেন। অথচ আশ্চর্য এই যে, উহারা যে-পরিমাণে হাসিতেছে, নিজে জব্দ ও কাহিল হইয়াও কিরণদা' পরিমাণে তার চেয়ে কম হাসিতেছেন না। আনন্দে ইহারা তাঁহাকে হারাইয়া দিবে, এ যদি ইহারা কেহ ভাবিয়া থাকে, তবে সে ভুল ভালো করিয়াই ভাঙ্গিয়াছে।

'স্থান নাই, স্থান নাই'—কারণ, কিরণদা'র ছোট সে-তরী ভাইটীরা কাণায় কাণায় ভরিয়া ফেলিয়াছে। স্থানাভাবে বেণুবাবু (রায়) কিরণদা'র ডেক চেয়ারের হাতলটাকে আসন বানাইয়া লইয়াছেন এবং সতীন রায়ের মত লোকও নিজের চেয়ারে যতীন দাশের জন্য উদ্বৃত্ত জায়গা তৈরি করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। হোমিওপ্যাথি ওষুধের বড় বাক্সটা ঠেলিয়া সরাইয়া টেবিলের উপর জায়গা করিয়া নিলাম। কিরণদা' সোৎসাহে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন—"এই যে আর এক শুয়োর।"

এই জীবটীর সঙ্গে আমার চেহারায় বা চরিত্রে কোন উল্লেখযোগ্য মিল ছিল বলিয়াই যে এ-সম্ভাষণ, তা নয়। কিরণদা'র স্নেহের পরিভাষায় এটি অতি বনেদী সম্ভাষণ এবং সর্বক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ অপ্রতিহত—ভাইটীদের বয়সের তারতম্য এক্ষেত্রে অবান্তর।

ঢুকিবার মুখেই শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, আমাদের বীরেনদা'-কেই (চাটার্জী) তিনি কহিতেছেন—"ও শুয়োর, তুমিও এ-দলে আছ। না বাপু, এ-রকম ক্ষেত্রে কোন মতামত না দেওয়াই ভালো।"

সবাই মত আদায় করিবেই, কিরণদা'ও তাহা প্রদান করিবেন না। বীরেনদা' কহিলেন—"ব্যাপারটা সত্য কি মিথ্যা, আপনি শুধু এইটুকু বলুন।"

—"ও শুয়োর, তুমি কায়দা করে কথা বের করবে, তা আমি বুঝতে পেরেছি।" বলিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন। ভাবখানা এই—এত কাঁচা লোক পাও নাই যে, সস্তাচালে মাৎ করিবে।

আমি কহিলাম—"কায়দা করে কথা বের করব না, সোজাই জিজ্ঞেস্ করছি।" কথা শেষ করিতে পারিলাম না। কিরণদা' সকলের দিকে দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া কহিলেন—"দেখলে, কথা বলার কায়দা। লেখক মানুষ কিনা।"

'লেখক মানুষ'—এমনভাবে উচ্চারণ করিলেন যেন মস্ত একটা গোপন খবর প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং লোকের যদি লজ্জা থাকে,

তবে এর পরে তার থামিয়া যাওয়া উচিত। আমিও থামিয়া চুপ করিলাম।

কিন্তু বীরেনদা' নাছোড়বান্দা। কহিলেন—"তবে আপনি বলতে চান যে আপনি 'স্বাধীনতা' বিক্রী করেন নি?"

কিরণদা'র পক্ষ হইয়া যতীন দাশ কহিল—"না, কিরণদা' তেমন কথা বলেন না।"

—"মেয়ে দুটি 'স্বাধীনতা' কিনতে চাইলে কিরণদা' তাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ান নি?"

—"না, পিছন ফিরে দাঁড়ান নি, মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন".—যতীন দাশ উত্তর করিল। কিরণদা' মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে উভয়ের এই সওয়াল-জবাব শুনিতে লাগিলেন।

—"তিনি কি দুকাপি পত্রিকা টেবিলে ফেলে দেন নি?"

—"তারা দুকাপিই চেয়েছিল।"

উত্তর শুনিয়া কিরণদা' সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন—"যতীন বলে ভালো। বীরেন, তুমি ওর সঙ্গে পারবে না।"

বীরেনদা' কহিলেন—"মেয়ে দুটী বেরিয়ে গেলে পর তবে আপনি ঘুরে দাঁড়ালেন, এ ঠিক কিনা বলুন।"

—"নিশ্চয় ঠিক। সত্য বলতে কিরণদা' পিছপা হন না।"

যতীন দাশের সমর্থন পক্ষে যাইতেছে না দেখিয়া কিরণদা' কহিলেন—"শুয়োর, তুমি থাম। তোমার আর আমার পক্ষে ওকালতী করতে হবে না।"

আমি আবৃত্তি করিলাম—"কিরণদা', যতীন বলে ভালো।"—হাসির একটা দমকা বাতাস বহিয়া গেল।

বীরেনদা' কহিলেন—"কেন আপনি ঘুরে দাঁড়ালেন? আর ওদের কাছে শেষটা আপনি 'স্বাধীনতা' বিক্রী করলেন?"

কিরণদা' নিরুত্তর।

নয়নাঞ্জন-বাবু (দাশ) আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরণদা', ওরা পয়সা দিয়েছিল তো?"

কিরণদা' কহিলেন—"কেন দেবে না? তোদের মত লক্ষ্মীছাড়া?" সবাই হাততালি দিয়া সোৎসাহে হৈ-হৈ করিয়া উঠিল—"ও কিরণদা', আপনি যে ধরা পড়ে গেলেন?"

কিরণদা'ও হাসিলেন—"ও শুয়োরের দল, তোমাদের এ-মতলব ছিল।"

বীরেনদা' কহিলেন—"আচ্ছা, মেয়েদের উপর আপনি এত চটা কেন? দেশে শুধু ছেলেই থাকবে—মেয়ে থাকবে না, এই বোধ হয় আপনি চান,—না?"

—"না, কক্ষনো না—"

—"কি কক্ষনো না?"

কিরণদা' উত্তর দিলেন না। একটী ছেলে কহিল—"কিরণদা', মোহমুদ্গর-period আজ আর নাই, অবশ্য কোনকালেই ছিল না। বৌদ্ধমঠে পর্যন্ত ভিক্ষুনী, আশ্রমে পর্যন্ত তপস্বিনী। এবার সবাইকে নিয়ে দল করবার পালা।"

—"শুয়োর, দাঁড়াও বার করছি তোমার পালা"—বলিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া মোহমুদ্গরকে একটী আঘাত প্রদান করিলেন। উপস্থিত সকলে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল।

সতীন রায় কহিল—"দিন্‌তো, আরও কয়েকটা দিন। মোহমুদ্গর বুঝাতে এসেছে। দিন্ লাঠিটা আমার হাতে দিন্, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

সতীন রায়ের হাতে লাঠি থাকা বেণুবাবু সমর্থন করেন না—তাই সতীন রায়ের উদ্যত বাহুকে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন—"না লাঠি পাবে না! গাণ্ডীব এক অর্জ্জুনের হাতেই থাকে—কি বলেন কিরণদা'?"

"তুই ঠিক বলেছিস ভাইটী। এ-লাঠি কেউ পাবে না।"

সতীন রায় কহিল—"লাঠি নয় পাব না, তাই বলে তার খোঁচাও পাব না?"

"খুব পাবে"—বলিয়া লাঠিটা নিজ হাতে বেণুবাবু তুলিয়া সতীন রায়ের প্রার্থনা মিটাইলেন। খোঁচা খাইয়া সতীন রায় উঠিয়া দাঁড়াইতেই

একটা হৈ-হৈ ব্যাপার উপস্থিত হইল। বীররসের অভিনয়ের জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

—"যাও বেণু, তোমাকে মার্জনা করে দিলাম"—বলিয়া সতীন রায় হাতের মুঠা হইতে ব্রাহ্মণ যেমন ফুল-দূর্বা ছুড়িয়া মারে তেমনি ভঙ্গীতে মার্জনাটাকে শূন্যে ছুড়িয়া দিল এবং বসিয়া পড়িল।

কিন্তু সতীন রায় বসিতেই যতীন দাশ চীৎকার করিয়া উঠিল--"উহু, গেছি গেছি"। সতীন রায় তার বিরাট নিতম্বদেশ একটু উত্তোলন করিলে যতীন দাশ সেই রোলারের তল হইতে নিজের শরীরটাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল--"ব্যাটা গুজরাটী হাতী।"

সতীন রায় যতীন দাশের আহত স্থানে যত্নের সহিত হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল--"বাবা, একটু খাওয়া-দাওয়া আর একটু exercise করো, বুঝলে?"

এমন সময় ধীরেন-মাস্টারের (নিয়োগী) গলা বাহিরে শোনা গেল। শৈলেন দাস (অধিকাংশের রুণুদা') মহাশয় ধীরেন-মাস্টারের নাম দিয়াছিল হিমেল্স্টস্। All Quiet-এর সৈনিকটীর সঙ্গে ধীরেন-মাস্টারের মিল রুণুবাবু আবিষ্কার করেন। সেই হইতে ধীরেন-মাস্টার হিমেল্স্টসের 'টস্' হইয়াই আখ্যাত হইত।

প্যারেড-ভলান্টিয়ার ইত্যাদি বিষয়ে মেজর সত্য গুপ্তের বিশ্বস্ত সহচর ছিল এই ধীরেন-মাস্টার। লাঠি, ছোরা, কুস্তী ইত্যাদি বিষয়ে মাস্টার শিক্ষা দিত ধরা-পড়ার আগে। মাস্টার-নাম ব্যায়ামশালাতেই অর্জিত।

দৃঢ় ও হৃষ্টপুষ্ট শরীর লইয়া ধীরেন-মাস্টার প্রবেশ করিল।

বীরেনদা' মোটা গলায় হুকুম করিলেন—'Halt',

ধীরেন-মাস্টার সত্যই দাঁড়াইয়া পড়িল।

বীরেনদা' কহিলেন--'স্যালুউট—ডিস্মিস্'।

কপালে হাত ঠেকাইয়া মিলিটারী কায়দায় স্যালুট সারিয়া মাস্টার লেফ্ট রাইট্-লেফ্ট পা ফেলিয়া আগাইয়া আসিয়া একটা জায়গা দখল করিল।

ধীরেন-মাস্টার ধরিয়া বসিল, কহিল—"কিরণদা' বলুন না, টেগার্ট সাহেবের কাছে কি-ওয়ারেন্ট দেখতে চেয়েছিলেন। আপনারা জানেন তো?"

জানিতাম না। জানিবার জন্য উদগ্রীব হইলাম।

নয়নবাবু কহিলেন—"জিজ্ঞেস করুন, কি-রকম ওয়ারেন্ট টেগার্ট-সাহেব দেখিয়েছিলেন।"

আমরা কহিলাম—"বলুন না কিরণদা', ব্যাপারটা কি।"

ধীরেন-মাস্টারের সঙ্গে আমরা সকলেই কিরণদা'কে চাপিয়া ধরিলাম এবং কিরণদা' বলিতে বাধ্য হইলেন।

কিরণদা' বলিতে রাজী হইলেন বটে, কিন্তু বলিবার সময় বিশেষ কিছু বলিলেন না। পুরানো আমলের লোক, নিজেদের বিষয়ে গল্প করিতে তেমন অভ্যস্ত হন নাই। সে-কালের শিক্ষা—মুখ বুজিয়া কাজ করিয়া যাওয়া। তাই অভ্যাসে এমন একটা সংযম কাজে ও ব্যবহারে এদের দেখা দিত, যা'র ফলে দরকার হইলেও দু'কথা তেমন করিয়া বলিতে পারেন না। মুখ বুজিয়া যে-জীবন আরম্ভ হয়, সে-জীবন তেমনি মুখ বুজিয়াই শেষ হয়: জীবনে যেন একটা গোপন নীরবতাকে বহন করিয়া লইয়া মৃত্যুর নীরবতার দুয়ারে পেঁছাইয়া দেওয়াই এঁদের একমাত্র কাজ।

কত কর্মী যে এইভাবে নিঃশব্দে কাজ করিতে করিতে শেষ হইয়াছে, বাহিরের লোকে তার খোঁজ রাখেনা, জানেও না। হয়তো তা'দের কথা তা'দের বন্ধুরা-ই ভুলিয়া গিয়াছে, কিম্বা মনে করিতে হইলে জোর করিয়া মনে আনে। নিজেদের কোন দাবিদাওয়া না রাখিয়া এ-ভাবে জীবন কাটাইয়া দিতে চরিত্রের যে-নিরাসক্তি ও দৃঢ়তার দরকার, তার জন্য সাধনার প্রয়োজন হয়। ইচ্ছা হইলেই এই জাতীয় সৈনিক হওয়া যায় না। আর, মানুষের যে-কোন বড় কাজের জন্য এই রকম মহৎ সৈনিকের প্রাণই ভিত্তিমূলে উৎসর্গীকৃত থাকে। সমাজের ভিত্তিভারবহনক্ষম প্রাণ খুব বেশী আসে না। যা'রাও আসে, তা'দের খবরও আমরা রাখি না: কারণ তা'দের চিনিবার জন্য যে-দৃষ্টি

দরকার আমরা সাধারণ সম্প্রদায় সে-দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত। আমরা শুধু দধীচির অস্থি-দেওয়ার ইতিহাসই জানি; কারণ তা'তে বজ্র তৈয়ারি হইয়াছিল এবং সে-বজ্র দেবতাদের কাজে লাগিয়াছিল। কিন্তু মানুষের জন্য যে-অস্থি গোপনে বজ্রে রূপান্তরিত হইয়া যায়, দেবতাদের কথা দূরে থাক, মানুষ নিজেই তার খোঁজ রাখে না; বিপদে ও দুর্দিনে তা'রই সাহায্যে যে জয়লাভ করে তা'ও সে জানে না। শক্তি কে, কোথায় ও কেমন করিয়া সবার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গেল—এ অজানাই থাকিয়া যায়। আর, সৃষ্টির নিয়মও বোধ হয় এই—শক্তি ব্যয় হয় প্রকাশ্যে, কিন্তু তা'র আয় ও সঞ্চয় হয় গোপনে।

কথার-ও যে একটা নিজস্ব দাম আছে, আগের লোকেরা তা' জানিলেও ব্যবহারে ও কাজে তা' তেমন স্বীকার পান না। এমন কথাও-তো শুনিয়াছি, যা' বুকের মধ্যে আগুন লাগাইয়া দেয়, ঝড় আনে, মনে সমুদ্র-মন্থন করে। একটী দিনের কথা মনে হইল।—

১৯২৪ সালে ফরিদপুরে গান্ধীজি Youth Conference-এ বক্তৃতা দিতেছেন। সকালবেলা গোটা নয়ের সময় সভা হইতেছিল, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের তাঁবুতেই সে-সভা বসিয়াছিল। মহাত্মাজীর পাশে দেশবন্ধু বসিয়াছিলেন, অসুস্থ শরীর, অল্প অল্প জ্বর, তাই নিয়াই উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাত্মাজী বসিয়াই বক্তৃতা দিতেছিলেন। সমস্ত সভা চুপ করিয়া শুনিতেছে। রোগা মানুষ, রোগা হাতের ক্ষীণ তর্জনীটি সভার দিকে তুলিয়া কথা বলিতেছেন—মুগ্ধ হইয়াই শুনিতেছিলাম। বলিতে বলিতে এক সময়ে কহিলেন—'জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রে-ই যদি বড় কিছু করিবার ইচ্ছা তোমাদের হয়, তবে একটিমাত্র বিষয়ের দিকে তোমাদের নজর দিতে হইবে। I have got one simple suggestion—private character.' তারপর থামিয়া বলিতে লাগিলেন—'Violence-এ স্বাধীনতা non-violence-এর চেয়ে আগে আসিবে, এ যদি প্রমাণ করিতে পার—তবে হয় আমি তোমাদের দলে আসিব, নয় পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইব।' তারপর প্রসঙ্গ-ক্রমে বলিলেন—'I can give my life this very

moment if country wants that.' শান্তভাবে বলিতেছেন, কোন চাঞ্চল্য নাই। শুনিয়া মনে হইল যে, জীবন-দেওয়া জিনিসটা যে কি, তা' ইনি যেন চোখের উপর দেখিতেছেন। এর উপরে যখন অতি ধীর ও শান্তভাবে একটী শব্দের পর আর একটী শব্দ উচ্চারণে অবকাশ রাখিয়া বলিলেন—'Friends believe me, I do not fear death', তখন হঠাৎ টের পাইলাম যে, আমার বুকের মধ্যে কে যেন ভয়ানকভাবে কাঁপিতেছে। চাহিয়া দেখিলাম, ঐ অদূরে ক্ষীণকায় লোকটি যেন চোখের উপর কাহাকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইতেছেন; তাঁর চোখ শ্রোতাদের দিকে থাকিলেও দৃষ্টি তাঁর অদৃশ্য-কিছুতে আবদ্ধ হইয়া আছে। কানে আসিল—'I fear God alone.'

আজও সে-কাঁপনের কথা ভুলি নাই। সত্য কথাই বলিব—একাকী জানালায় বসিয়া যখন এই স্মৃতির কথা লিখিতে গিয়া কলম থামাইয়া গতদিনের সে-ছবি মনে আনিতেছিলাম, তখন সেই দিনের বুকের কম্পন আজ আবার টের পাইলাম। টের পাইলাম যে, শুধু বুকই থর থর করিয়া কাঁপিতেছে না, আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চ দিয়া উঠিতেছে। 'I do not fear death',—কী ক্ষণেই ক্ষীণকণ্ঠ হইতে বাহির হইয়াছিল যে, আমার বুকের মধ্যে তা' চিরকালের জন্য বাসা নিয়াছে। এখন যখনই ঐ ছবি ও কথা মনে হয়, বুকের মধ্যে একটা মানুষ তখনই থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। 'মৃত্যুকে আমি ভয় করি না'—এই কথা কয়টির মধ্যে গান্ধীজি তাঁর নিজের অস্তিত্বের অগ্নিময় অমর-অংশ নিশ্চয় কিছু ভরিয়া দিয়া থাকিবেন। তাইতো ঐ-আগুনকে জায়গা দিতে ভিতরে কে যেন আমার আজও ভয়ে এমন কাঁপিয়া উঠে। জানিনা, কথায় এমন অমোঘ-শক্তি ও তার জ্বালা কেমন করিয়া কি সুকৌশলে তিনি ভরিয়া দিলেন।

আজ আমি বিশ্বাস করি, মানুষের মনের গভীর-প্রদেশ হইতে এমন কথা বাহির হয়, যা'তে অপরের মন চিরকালের মত জখম হইতে পারে, জ্বলিতে পারে বা আমূল বদলাইয়া যাইতে পারে। এ আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা। কথা যে কত প্রচণ্ড ও ভয়ানক তা' জানিতে

পারিয়াছি। কিন্তু মনের কোন্ গহন-লোক হইতে এদের আনিতে হয়, তা' আজও জানিতে পারি নাই। বোধ হয়, মনের সেই শক্তির রহস্য-ঘরের সন্ধান কোন দিন পাইবও না। মনের বাহির দুয়ারেই আমরা পড়িয়া আছি, সেখানেই আমরা জীবন কাটাইয়া দেই—ভিতর দুয়ার চিরকাল আবদ্ধ থাকিয়াই যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য দুর্ভাগ্য এই যে, ভিতরের দিকে যাইবার যে একটা কপাট আছে, তা আমরা জানিও না। এইজন্যই মহাপুরুষদের সঙ্গ প্রয়োজন, কিম্বা বিশ্বাস নিয়া নিজের আপ্রাণ চেষ্টা দরকার। একবার কপাট খুলিতে পারিলে, মনের অমর-দিকের সন্ধান পাওয়া যায়, সমস্ত ভয় ঘুচিয়া যায়, জীবনের অর্থ একেবারে বদলাইয়া যায়। তখনই কথায় এত জোর হয় যে, পাহাড় পর্যন্ত টলিয়া যায়।

* * * *

কিরণদা' যাহা বলিলেন, তাহাই নিজের মত করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ঘরের দরজা তখনও বন্ধ ছিল। বাহিরে অনেকগুলি ভারী জুতার শব্দ শোনা গেল—সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে। গট্‌গট্ শব্দ করিয়া পায়ের শব্দ দরজার গোড়ায় আসিয়া থামিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে কড়া নড়িয়া উঠিল। সাহেবী কণ্ঠে হুকুম শোনা গেল—"Open the door".

বাহিরের লোকগুলির বোধ হয় অত্যন্ত জরুরী কাজ, তাই তর সহিতেছিল না। দরজা-খোলার অবসর না দিয়া এবার কড়া-নাড়ার বদলে সশব্দে দরজায় ধাক্কা পড়িতে লাগিল। ধাক্কাগুলির জোর উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। মনে হইতে পারে যে বন্ধ দরজার পাশে আসিয়া অপেক্ষা করিতে হয়—এ সাধারণ নিয়ম আগন্তুকগণ তাহাদের ক্ষেত্রে-ও প্রযোজ্য হইবে, এ মোটেই পছন্দ করিতেছেন না।

কিরণদা' একটি ছেলেকে কহিলেন—"দেখ্ তো কারা, দরজাটা ভাঙ্গবে নাকি?"

কাহারা—দেখিবার জন্য ছেলেটি দরজা খুলিয়া দিতেই হুড়মুড়

করিয়া যাঁহারা ঢুকিয়া পড়িলেন, দেখা গেল তাঁহারা পুলিশের লোক—দেশী-বিদেশী সাদা-কালোয়-মিশানো বাহিনী। যে-ভাবে ঢুকিল, তা'তে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মানুষের প্রকৃতিতে বন্য পশুটা এখনও টিঁকিয়া আছে, সুযোগ পাইলেই কথায় বার্তায়, চলাফেরায় তা বাহির হইয়া পড়ে।

এ-বাহিনীর নেতৃত্বে দেখা গেল স্বয়ং টেগার্ট-সাহেব নিজেই আসিয়াছেন। সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন শিষ্য কল্‌সন্‌-সাহেবকে। কিছুদিন পরে গুরুর আসন শিষ্য দখল করিবে, তাই সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া গড়িয়া রাখিয়া যাইতেছেন। সাহেব, সার্জেণ্ট, দারোগা ও পুলিশে ঘরটি ভরিয়া গেল।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন—"Who is Kiron Mukherjee?"

কিরণদা' জানাইলেন যে, ও-নামের মালিক তিনিই।

টেগার্ট-সাহেব ভ্রূ, কপাল ও চক্ষু কুঁচকাইয়া কিরণদা'কে কিছুক্ষণের জন্য দেখিয়া লইলেন। এই রোগা, বেঁটে, ভগ্নহস্ত খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ লোকটীকে কিরণ-মুখার্জী বলিয়া বিশ্বাস করিতে তাঁর মন হয়তো চাহিতেছিল না। কিম্বা হয়তো দেখিয়া লইতেছিলেন, এই লোকগুলির মধ্যে এমন কি থাকিতে পারে, যার জন্য সরকারকে হয়রাণ ও ভীত করিয়া তোলে। কর্কশ-ভাষায় জানাইলেন—"You are under arrest."

"Under arrest? Where is the warrant?"

কিরণদা' ওয়ারেণ্টের কথা জিজ্ঞাসা করায় টেগার্ট-সাহেব বাঁ-হাত দিয়া একটা পিস্তল বাহির করিয়া লইয়া সেটা কিরণদা'র মুখের কাছে তুলিয়া ধরিলেন, কহিলেন—"This is the warrant?"

দুই পাশ হইতে দুজন হিন্দুস্থানী কিরণদা'র দুই হাত চাপিয়া ধরিল।

সামনের দেয়ালে একখানা বড় ছবি টাঙানো ছিল, টেগার্ট-সাহেবের দৃষ্টি তার উপর গিয়া পড়িল। আগাইয়া ছবিখানা দেখিয়া লইয়াই তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলেন না। হাতের ছড়িটা দিয়া ছবিটার উপর

উপর্য্যুপরি গোটাকতক বাড়ি দিতেই ঝন্ ঝন্ শব্দে কাঁচ ভাঙিয়া নীচে ছড়াইয়া পড়িল এবং ছবিটাও দেয়াল হইতে ছিন্ন হইয়া নীচে নামিয়া আসিল। নির্জীব ছবি কোন প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু যে-ছবির উপর টেগার্ট-সাহেবের এত আক্রোশ যে, এতগুলি লোকের সামনে রাগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, ছেলেমানুষের মত তা' এইভাবে প্রকাশ করিয়া বসিলেন, এবং যে-ছবিটির উপর এই অত্যাচার ও অপমান দেখিয়া কিরণদা'র বয়স্ক চোখেও আগুন ঝিলিক দিয়া গেল—সে-ছবির পরিচয় দরকার।

ছবিটি যতীন মুখার্জির। তাঁর চারজন সহকর্মীর সঙ্গে মিলিয়া তিনি সরকারের পুলিশ ও সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করিতেছেন—যুদ্ধের এই ছবিটি একজন আর্টিস্টকে দিয়া আঁকাইয়া লইয়া কিরণদা' সযত্নে বাঁধাইয়া লইয়াছিলেন। বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্র মুখার্জিকে টেগার্ট সাহেব চিনিতেন। তাই ছবিটি দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন এবং খেপিয়া গিয়া এমন কাজ করিয়াছিলেন। অথচ শোনা যায়, এই টেগার্ট সাহেবই একদিন যতীন-মুখার্জী সম্বন্ধে সশ্রদ্ধভাবে বলিয়াছিলেন—"He is the only Bengali who fought from trench."—সে ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের কথা।

আজ তিনি বীরের জন্য সে-শ্রদ্ধা রাখিতে পারেন নাই, ইতর লোকের মনোবৃত্তি প্রকাশ করিয়া বসিলেন। বিবেকানন্দের ছাড়া এমন তেজোদীপ্ত ছবি আর কোন বাঙ্গালীর দেখা যায় না। বীরের এই তেজস্বী প্রকৃতির সম্মুখে শান্ত থাকাই তাঁর উচিত ছিল, এ-ছবিকে অপমান না করিলেও তিনি পারিতেন।

টেগার্ট-সাহেব আজ যে-চেহারা দেখাইলেন, তা'তে অনেক কথাই মনে আসে। টেগার্ট-সাহেব নিজে সাধারণ ব্যক্তি নন, সামান্য অবস্থা হইতে আজ এত বড় হইতে পারিয়াছেন, কারণ তিনি সত্যই সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। বাংলা তাঁর নিকট ঋণী। কলিকাতাকে গুণ্ডার হাত হইতে মুক্তি তিনিই দিয়াছেন। Calcutta Police এক রকম তাঁরই সৃষ্টি। সামান্য পুলিশ হইতে ইন্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর

পর্যন্ত তিনি পথ করিয়া গিয়াছেন। তাঁরই মত লোকের চেষ্টা ও কর্ম-প্রতিভায় সামান্য একটি দ্বীপের অধিবাসীরা এত বড় হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীতে ইংরেজ যে এত বড় সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে, তা তো মিথ্যার উপর দাঁড়ায় নাই। বহু সাহসী, অদম্য-উৎসাহশীল ইংরেজ সন্তানের আপ্রাণ চেষ্টা এর পিছনে রহিয়াছে। মুখের কথায় বা আক্রোশে তো এ-জাতিকে ছোট করা যায় না। এ-জাতির প্রাপ্য সম্মান যা তা তাকে দিতেই হইবে। পৃথিবীর এত বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে ইংরাজ-সাম্রাজ্যের মত বস্তু দ্বিতীয়টি দেখা দেয় নাই।

ইংরেজ-জাতি বড়, তার মধ্যে বড় মানুষ আছে, তার মধ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-প্রতিভা আছে—এ স্বীকার না পাইলে মিথ্যা-ব্যবহার করা হইবে।

কিন্তু সেই জাতিরই প্রতিনিধি-স্থানীয় টেগার্ট-সাহেবের আজিকার ব্যবহার- সত্যই আশ্চর্য হইতে হয়! বিকলাঙ্গ বৃদ্ধের মুখের উপর পিস্তল তুলিয়া ধরিয়া বীরত্ব এবং একটি ছবির উপর বিজাতীয় আক্রোশ—এ কি বড়র কাজ! ইংরেজের মধ্যে যারা বড়—তারাও যদি মানুষের মানদণ্ড হইতে এত নীচে নামিয়া পড়েন, তবে সত্যিই ভাবিতে হয় যে, এই জাতির নীচে নামিবার দিন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে কিনা। মানুষের মধ্যে যাঁরা বড়, তাঁরা যে-জাতিরই হোক, তাঁদের মধ্যে একটা দিক থাকে, যা ভূগোলের ও ইতিহাসের সঙ্কীর্ণ সীমা ডিঙ্গাইয়া যায় এবং সর্বমানুষের আত্মীয়তা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। টেগার্ট-সাহেব শোচনীয়ভাবে সে-দিন ঐ সত্যিকার মানুষের পর্যায় হইতে চ্যুত হইয়াছেন। অথচ সে-দিন তাঁর কতবড় সুযোগ ছিল, মানুষের মহৎ-স্তরে উঠিবার।

হয়তো ভুল করিতেছি। একটি মানুষকে দিয়া যেমন গোটা একটা জাতিকে বিচার করা ভুল, একটিমাত্র ঘটনাকে বাছিয়া নিয়া সমগ্র মানুষটিকে বিচার করাও তেমনি ভুল পদ্ধতি। তবু আমার ক্ষোভ থাকিয়া যায়। ইংরেজ যদি তার ভালো দিকটা দেখাইত, আমার সঙ্গে

ব্যবহারে তার বড় দিকটা-ই ব্যবহার করিত, তবে আমার সত্যিকার উপকার হইত, সেও লাভবান হইত। আমাদিগকে বড় হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া সে-ও যে আসলে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, একটু তলাইয়া দেখিলেই তা ধরা পড়িবে।

ইংরেজ শত্রুতা করুক, তাতে আপত্তি করি না। তার নিজের স্বার্থ মরণ-কামড় দিয়া রক্ষা করিতে নির্মম ও কঠোর হউক, কিন্তু সে যেন মানুষের স্তর হইতে না নামিয়া যায়। মানুষের সভ্যতার জন্য তারও দায়িত্ব আছে। তার কর্তব্য সে না করিলে অপরের বোঝা আরও ভারি হইয়া উঠে। ইংরেজ ভারতবর্ষের সঙ্গে শত্রুতা করুক এবং সে-শত্রুতা চিরশত্রুতা হইলেও আমি চিন্তিত হই না। কিন্তু ইংরেজ যখন ছোট হইয়া যায়—তখন তার পাপে আমাদের-ও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিতে হয়, এবং মানুষের বদলে পশু সাজিয়া মানুষের সমাজকে যে কোন্ ভয়ঙ্কর সর্বনাশের দিকে তখনই আমরা পিঠে বহন করিয়া আগাইয়া চলি--তা' ইতিহাস-বিধাতাই জানেন।

মানুষের সঙ্গে মানুষ হইয়া শত্রুতা কর--সভ্যতার অঙ্গ-হানি ও ক্ষতি হইবে না। কিন্তু পশুকে দিয়া মানুষকে ঠেকানো, তাতে যে সমস্ত সভ্যতা ও সমাজকে হনন করার জন্য পশুকে লেলাইয়া দেওয়া হয়, তা' বুঝিবার দিন কি আজও আসে নাই?

আমার মনের গঠনে নিশ্চয় কোথাও কোন বিষম ত্রুটি আছে, যার জন্য প্রত্যহের দৈনন্দিন ঘটনা আমার তেমন মনে থাকে না। এমন কি বড় বড় ঘটনা পর্যন্ত স্মৃতিতে কোন স্থায়ী দাগ রাখে নাই, এ আমি দেখিয়াছি। আমার মন যে-অংশটা দিয়া মনে রাখে, তার সেই স্মৃতির ভাঁড়ার-ঘরে নিশ্চয় বড় একটি সিঁধ আছে—সব সঞ্চয় সে-পথে সরিয়া পড়ে, সঞ্চিত কিছু হইতে পায় না।

স্মরণ-শক্তি আর দশজনের চেয়ে যে আমার কম, ঠিক তা নয়। মনের গঠন-দোষে স্মৃতি-শক্তির স্বভাবই এমন হইয়াছে যে, ঘটনা বা অভিজ্ঞতার শিকলে যে অতীতকে বাঁধিয়া রাখিবে, সে-রকম চেষ্টাই এখানে অতি কম। আমার মনে হয়, এই জন্যই আমার মধ্যে কিছু দানা বাঁধিতেছে না। আমার মধ্যে ইতিহাস নাই, কারণ সময়ের স্বভাব আমার স্মৃতিতে আসিয়া বিকৃত হইয়া যায়। আর সময়-ই তো ইতিহাসের ভিত্তি।

বহুবার অনুসন্ধান করিয়াছি এই মনে-রাখা ব্যাপারটি কি বুঝিবার জন্য। দেখিয়াছি—সময় ও স্মৃতি একই জায়গায় মিশিয়া গিয়াছে এবং উহাদের আমি একই বস্তু বলিয়া বোধ করিয়াছি। আর একটি বিষয়-ও লক্ষ্য করিয়াছি—সময়ের সত্যিকার ধারাবাহিকতা নাই। একটি স্থিতি, একটি 'আছে-আছে' ছাড়া অন্য কিছু দেখিতে পাই নাই। স্মৃতিকে সরাইলে অতীত বা বর্তমান কিছু থাকে না। শুধু থাকে একটা 'থাকা'। এই 'থাকাটা' হইতে সরিয়া আসিলেই মন একে ধরিতে বুঝিতে গিয়া স্মৃতি দিয়া যে-অংশটা পায়, তাই অতীত এবং আশঙ্কা ও কামনা দিয়া যা ধরিতে চায়, তাই ভবিষ্যৎ। আসলে অতীত বা ভবিষ্যৎ নাই, কারণ আমি তার কোন ভিত্তি-ভূমি ও আশ্রয়-স্থান দেখিতে পাই নাই।--আমার ভুল-ও হইতে পারে, কারণ—আমি নিজের মন বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ এক অসম্ভব সমস্যা।

মোট কথা, যে-কোন কারণেই হউক মনের একটা জায়গায় বেশ

একটু মোচড় খাইয়া আমার স্মৃতি-শক্তিতে ও তার স্বভাবে এ-রকম ঘটিয়াছে, যার ফলে জীবনের ঘটনাগুলি আসে যায় কিন্তু বাঁধা পড়ে না।

তাই এই বন্দি-জীবনের সব ঘটনা এমন ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। ঘটিবার সময় ঘটনাগুলি আর দশজনের মত আমাকেও চঞ্চল করিয়াছে, উত্তেজিত করিয়াছে, এবং এমন কি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পর্যন্ত করিয়াছে। কিন্তু সেই শক্তিমান একমাত্র-সত্য ঘটনাগুলি এখন কোথায়? ছায়ার মত কে তাদের এমন করিয়া সরাইয়া নিল?

এও তো কম আশ্চর্য নয়—একা একা বসিয়া যখন ভাবি, এখন যেমন লিখিতেছি, তখন বাহিরে পৃথিবী এত ছোট ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়! এই জেল তার সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি নিয়া বেমালুম সরিয়া গিয়াছে—পৃথিবী এত হালকা হইয়া দূরে পড়িয়া রহিয়াছে যে, কলম থামাইয়া নিয়া জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া তবে পৃথিবী সম্বন্ধে সচেতন ও সজাগ হইতেছি। কিন্তু বাহির তার এই জেলখানা-কয়েদী-সিপাহী-কর্মচারী ইত্যাদি সমস্ত দিয়া ছবির মত লাগিতেছে, এর সঙ্গে আমার তো কোন যোগ-ই খুঁজিয়া পাই না!

যখনই একা থাকি, একা ভাবনা-চিন্তা করি, তখনই টের পাই—মানুষ একটা জায়গায় বড় একা। জীবনের ও সংসারের কোন-কিছুই সেই একক মানুষকে স্পর্শ করে না। বাহিরের সঙ্গে ভিতরের মানুষটির যোগ সত্য ও স্থায়ী নয়—উভয়ের মাঝখানে মস্তবড় একটি বিদারণ রেখা রহিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। নিজের যে-একক চেহারা দেখিয়াছি, তাতে আজ আমার আর কোন সন্দেহ নাই, পরিষ্কার বুঝিয়াছি—আমি ও আমার পৃথিবী এই-দুইয়ের সৃষ্টির মূলে দু'টি বিভিন্ন বস্তু রহিয়াছে। একটির সঙ্গে অপরটির গুণে ধর্মে বা প্রকৃতিতে কোন সাদৃশ্য নাই, একটিকে দিয়া অপরটিকে বুঝা যায় না। অথচ কোন গূঢ় কারণে এই পরস্পর-বিরুদ্ধ দু'টি বস্তু একত্র মিলিয়া এই সৃষ্টিতে প্রকাশ পাইতেছে। এ-রহস্য উদ্ঘাটন কে করিবে বা আদৌ এ-রহস্য উদ্ঘাটিত হইবার কিনা—জানি না।

যে মন দিয়া বাহিরের সঙ্গে এবারকার জীবনে লেন-দেন কারবার করিতেছি, সে-মনের স্বভাবের সব পরিচয় পাই নাই। চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু এ-টুকু সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হইতে পারিয়াছি যে বাহিরে যত ঘটনা ঘটে, তা' বড়ই হোক আর ছোটই হোক, তা'র মূল্য ও অর্থ ঠিক অন্য দশজনের মত করিয়া আমি গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। মন-ই আমার একস্থানে বিকল হইয়া গিয়াছে। সংঘর্ষ ও হানাহানির ঘটনা-বহুল পৃথিবী আমাকে পরিত্যক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমার মন-ও পৃথিবীর কোন সম্বন্ধ সত্য-করিয়া গ্রহণ করে না।

জেলখানায় ক্যাম্পে এত ঘটনা ঘটিয়াছে, যা'তে আমাদের মন বিষাক্ত হইয়াছে। ছোটখাটো ঘটনায় ও ব্যবহারে সরকার ও তার কর্মচারীরা এমন প্রকৃতি দেখাইয়াছে যে, সম্মান নিয়া জীবন-ধারণ সম্ভব হয় নাই। মরীয়া হইয়া একটা-কিছু করিয়া ফেলিয়া এই নিত্যিকার অপমানের ও অসহ যন্ত্রণার শেষ দেখিবার জন্য মনে ইচ্ছা জাগে নাই এমন কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আত্মহত্যা মীমাংসার পথ নহে—ভীরুর মত পলায়নের পথও তাকে বলা যায়। কিন্তু সে-পথের আভাস সুস্থ মানুষেরও চোখে ঝিলিক দিয়া গিয়াছে। ওই-পথই শেষে একমাত্র পথ—সবল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও সেই সিদ্ধান্তকে মাঝে মাঝে মনে আনাগোনা করিতে দেখিয়াছে। কিন্তু আত্মহত্যাকে অগ্রাহ্য বলিয়া মরীয়া হইয়া অন্য যে-উপায় মন গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে—তাও আত্মহত্যার নামান্তর। সম্মানহীন জীবন অপমানে-দুর্ভর হইয়া যখন সহ্যের প্রান্ত-সীমা স্পর্শ করে তখন বুদ্ধি এই পরামর্শই দিত, শুধু আমাকে একা নয়, সবাইকেই যে—মার ও মর।

শুধু টিকিয়া-থাকায় যখন মন সায় দেয় না, তৃপ্ত হয় না, তখন প্রাণের উপর মমতা কমিয়া যায়। সম্মান চাই, মানুষের সহজাত অধিকার চাই, কিন্তু সংঘবদ্ধ শক্তি তা' হইতে দিতেছে না। মানুষকে যে মানুষের মত হইতে দিতেছে না, পশুর পর্যায়ে প্রায় ঠেলিয়া নিয়াছে, তা'কে এ-পৃথিবী হইতে সরাইয়া দেও এবং তুমিও সর,

কারণ তোমরা উভয়েই মানুষকে পশু করিবার জন্য দুই দিক দিয়া সাহায্য করিয়াছ—বুদ্ধি তখন চিন্তার এই-পথ ধরিয়াই চলিত। নিজে যখন মরিতেই বসিয়াছ, তবে আর মায়া কেন? সময় থাকিতে প্রাণটা দিয়া দাও এবং অপরপক্ষকেও সঙ্গে নিয়া যাও যাইবার সময়।—এই মানসিকতা অপরের বুঝিবার পক্ষে সুসম্ভব নহে।

জেলখানায় এতগুলি লোক একত্র মিলিয়া দিন কাটাইতেছে। গল্প-গুজব-হাসি-ঠাট্টা-আড্ডা-হৈ-হৈ ইত্যাদি দিয়া জেলের দিনগুলি পার করিয়া চলিয়াছে। কেহ বা পড়াশুনা ইত্যাদিতে মগ্ন রহিয়াছে। সময় তাদের উপর দিয়া গড়াইয়া পার হইয়া যাইতেছে—পাথরের উপর দিয়া যেমন জলের ধারা যায়। বাহির হইতে দেখিলে বাহিরের লোকের জীবন-যাত্রার সঙ্গে এর তেমন কোন পার্থক্য লক্ষিত নাও হইতে পারে। কিন্তু এর যে-কোন একজনকে ধরিয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে পার্থক্য কোথায়, অত্যাচার, শারীরিক ও মানসিক দুই-ই, এদের উপর কতবড় চিহ্ন রাখিয়াছে। নিজের দেশ নিজের বলিয়া পাইতে যে কত কষ্ট ও লাঞ্ছনা পাইতে হয়—তা' তখন চোখের উপর পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। জন্মিলেই বাঁচার অধিকার জন্মে না—এ-কথা অসম্ভব ও আশ্চর্য শুনাইতে পারে, কিন্তু এ যে কত কঠোর সত্য তখন আর সন্দেহ থাকিবে না। সকলেরই জন্মভূমি আছে, সকলেরই স্বদেশ আছে, কিন্তু আমার তা' থাকিতে পারিবে না—এ-কথা মানিতে পারে নাই, তাই শক্তিমানের কতবড় আক্রোশ যে এদের উপর পড়িয়াছে—তখন হয়তো বুঝা যাইতে পারে।

একা একা মন বড় বিষণ্ণ হইয়া উঠে, ভাবি—এতবড় পৃথিবীতে মানুষের জায়গা কুলাইতেছে না, একজনের বাঁচা অপরের অন্তরায় হইতেছে। অমানুষিক এক অবস্থার সম্মুখে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। পৃথিবী, যা' কারু নিজস্ব সম্পত্তি নয়, বাসের জন্য যেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়ু নিয়া মানুষ আসিতেছে—সেখানে তা'র বাসের জায়গায় অভাব নাই, চেষ্টা করিলে অন্নবস্ত্রেরও অভাব মিটিয়া যায়। কিন্তু মানুষের লোভকে জায়গা দিবে এত বিস্তৃতি এ-ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলে

নাই। আর সে লোভ যখন শক্তিতে অন্ধ হয়, বুদ্ধি-বিজ্ঞান যখন সে-শক্তিকে আরও যোগান দেয়—তখনই ভয়ঙ্কর অবস্থা দিন দিন আরও ভয়াবহ হয়।

ইতিহাসের ইঙ্গিত চোখে আঙ্গুল দিয়া কতবড় সর্বনাশকে দেখাইতে চাহিতেছে, কি-পরিণাম যে অপেক্ষা করিতেছে—শক্তিমানের অসংযত লোভ তা' গ্রাহ্য করে না বা দেখিতে পায় না। কিন্তু সৃষ্টির মূলে অমোঘ বিধান আছে, সেখানে সত্যই কোন ক্ষমা বা মার্জনা নাই।

পৃথিবী এবং তা'র পৃষ্ঠোপরি যে-মানুষগুলি চলাফেরা করিতেছে, তার একটি পরিষ্কার ছবি মনে আনিতে গিয়া দেখি যে—চারিদিক রুদ্ধ, আলো-বাতাস আসার ক্ষুদ্র ছিদ্র পর্যন্ত নাই, এমনই একটি আবদ্ধ কামরার-মত পৃথিবী মানুষগুলিকে ভিতরে বোঝাই করিয়া লইয়া শূন্যে ছুটিতেছে। ভিতরের মানুষগুলি আলোর অভাবে একে অপরের মুখ দেখিতে পাইতেছে না। এই অন্ধকার আবেষ্টনীর বাহিরে যে একটা বাহির আছে - তা' তারা জানে না। আবদ্ধ অন্ধকারে শুধু অসংখ্য নখর ও দন্ত-ঘর্ষণ হইতেছে, আর জানোয়ারের চীৎকার থাকিয়া থাকিয়া উঠিতেছে।

পশুদের কামড়া-কামড়ি-হানাহানি ইত্যাদির একপাশে কি এমন কোন মানুষ বা শিশু বর্ধিত হইতেছে না, যে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে? সে-ই হয়তো একদিন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, মাথার উপরের আচ্ছাদন সরাইয়া দিবে তখন বাহির হইতে আলো আসিবে, মানুষ মানুষের মুখ দেখিতে পাইবে এবং পশুর নখর-দন্ত অন্ধকারের সঙ্গেই দূর হইয়া যাইবে। সমস্ত মন দিয়াই প্রার্থনা করি—মানুষের সে-মুক্তিদাতা মানুষ আসুক।

আজ এই জেলখানা আমার কাছে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী হইতে এ বিচ্ছিন্ন নয়। জেলখানা হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইব—এ আবদ্ধ পৃথিবীতে-ই তো থাকিতে হইবে! মনের মধ্যে প্রার্থনা-রত একটি মানুষকে দেখিতেছি—পৃথিবীর জন্য সে মুক্তি চাহিতেছে। কিন্তু ভিতরে-তো দেবতার সেই মাভৈঃ-আশ্বাস শুনিতে

পাইতেছি না। মনকে বলি—বিশ্বাস যেন না টলে, মানুষের মহান-ভবিষ্যতে বিশ্বাস যেন দৃঢ় থাকে। সময় হইলেই দেবতার কাজ দেবতাই করিবেন।

* * * *

তীর্থে দেবতাই শুধু থাকেন না, পাণ্ডারাও থাকেন। প্রতাপে দেবতাকে ইঁহারা বহুগুণে ছাড়াইয়া যান এবং ইঁহাদের দৌরাত্ম্যের সীমা নাই বলিলে অত্যুক্তি-দোষ ঘটে না। দেবতার পাথরের শরীর, এতে হয়তো তাঁর কিছু যায় আসে না। কিন্তু মানুষের রক্ত-মাংসের শরীর—পাথরের দেবতার মত মুখ বুজিয়া সহ্য করার সুবিধা তার নাই। তাই পাণ্ডার প্রতাপে তীর্থ-যাত্রীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতে বেশীক্ষণ লাগে না।

'ইলিসিয়াম রো' আমাদের কাছে তেমনি একটি তীর্থস্থান—হিন্দুর কাছে কাশী যেমন, অবশ্য ভিন্ন অর্থে। এখানে তীর্থ-দেবতার সাক্ষাৎ মেলে না, মেলে পাণ্ডার দর্শন। কাশীতে বাবা বিশ্বনাথ অধিষ্ঠিত—'ইলিসিয়াম রোতে' কোন্ নাথের অধিষ্ঠান, তা' সঠিক বলা না গেলেও এটুকু বলা যায় যে, এখানে 'বঙ্গ-নাথ' মানে আই-বি অধিষ্ঠিত।

'ইলিসিয়াম রো' তার বিদেশী নাম ছাড়িয়া আজ স্বদেশী নাম নিয়াছে—লর্ড সিংহ-রোড। আই-বি অফিসকে আমরা এই রাস্তার নামেই বুঝিতাম ও বুঝাইতাম।

লর্ড সিংহ-রোডে কারু ডাক পড়িয়াছে, এ-সম্বাদে আমাদের মুখের যে-চেহারা হইত, তা'র সরল বাংলা-তর্জমা এই--'সেরেছে রে।'

বাংলার সেটা সে-দিন, যে দিন তা'র অদৃষ্টে শনির দৃষ্টি কুপিত হইয়াছিল ও পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল। লর্ড-আরুইনের গভর্মেন্ট দুর্বল ও ভীরু বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, বণিকের হাতে রাজশক্তি আসিয়াছে। ক্লাইভ-স্ট্রীট হইতে তখন ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইত। পুলিশের হাতে তখন যে ক্ষমতা এ'রা দিয়াছিলেন, তা'তে হিটলার মুসোলিনি স্ট্যালিন পর্যন্ত

ঈর্ষাতুর হইতে পারিতেন। বাংলার বেসরকারী ইংরেজ-মহল সে-দিন বড় কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সৈন্য পুলিশ সরকার ইত্যাদির উপর আস্থা রাখিতে না পারিয়া Royalist Party-গঠন করিয়া বাংলার সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলার ভার আপনাদের হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। আর সর্বোপরি স্যার এন্ডারসনের লৌহ-হস্ত বরাভয় লইয়া প্রসারিত ছিল।

Statesman-পত্রিকা খুলিয়া পড়িতাম—আমরা born criminal, আমাদের রক্তে Criminal-দের ঐতিহ্য ধারাবাহিকভাবে বহিয়া আসিতেছে। অতএব, একদিনের Statesman-এ দেখিলাম, এই Criminal-দের সমূলে উচ্ছেদ করিয়া বাঙ্গালার সমাজের মহা ও স্থায়ী হিত-সাধন আশু কর্তব্য। জনৈক ইংরেজ-কর্মচারীর হত্যার পর Statesman ('ও ভারতবন্ধু')-পত্রিকায় দেখিলাম যে Terrorist-দের উপর justice ইত্যাদি দেখানোর কথা আর মুখে আনা উচিত নহে; ক্যাম্পে ও জেলে যারা আছে, সেই বন্দীদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া আনা হউক, তাদের দেয়ালের দিকে পিঠ করিয়া গুলি করিয়া মারা হউক।

কেন যে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই, তা' জানি না। কিন্তু সে-দিন এ-ব্যবস্থা অবলম্বন করার কোন মানসিক বাধা বেসরকারী-ইংরেজের মনে ছিল না এ আমরা সত্যই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমাদের মনের আড়ালে একটা আশঙ্কা সর্বদাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছিল যে, যে-কোন সময়েই দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়া দাঁড়াইবার জন্য ডাকিয়া নিতে পারে—তারপর বুক পাতিয়া গুলি লইতে হইবে।

Statesman-এর আড়ালে সে-দিনের ইংরেজের সরকারী ও বেসরকারী-মনোভাবই গুপ্ত ছিল। বাছিয়া বাছিয়া গুলি করিয়া মারিবার পন্থা সরকার নেয় নাই, এ-সত্য অস্বীকার পাইব না। কিন্তু একদিন পত্রিকা পাইতে দেরী হওয়ায় অস্থির হইয়া Commandant-কে চিঠি দিতে তিনি অফিসে নেতৃ-স্থানীয় কয়েকজনকে ডাকিয়া নিলেন।

তাঁরা কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁদের পিছনে পিছনে অফিসের গুর্খা-আর্দালী পত্রিকা লইয়া আসিল এবং যথাস্থানে রাখিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

ক্ষণপরেই সারা ক্যাম্পে একটা বিষাদের ছায়া নামিয়া পড়িল। Commandant ডাকিয়া দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, কাগজ তিনি ভিতরে পাঠান নাই, কারণ পত্রিকাতে একটি ভয়ানক দুঃসম্বাদ আছে। হিজলী-ক্যাম্পে রাত্রিবেলা সিপাহীরা ভিতরে ঢুকিয়া গুলি চালাইয়াছে। দু'জন বন্দী মারা গিয়াছে, আহতদের মধ্যে জনদশেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ-সম্বাদে পাছে এ-ক্যাম্পের বন্দীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে, সেইজন্যই পত্রিকা দিবার আগে নেতৃ-স্থানীয়দের তিনি ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন।

বক্সা-দুর্গের বারান্দায় বসিয়া সে-দিন কি ভাবিয়াছিলাম, আজ আর মনে নাই। শুধু মনে আছে—তখন পশ্চিমে পাহাড়ের আড়ালে বৈকালের সূর্য ঢাকা পড়িয়াছিল। দেখিয়াছিলাম—দক্ষিণে বিস্তীর্ণ বাংলাদেশ পড়িয়া আছে, উত্তরে ঘন অরণ্যে অন্ধকার হইয়াছে এবং আকাশে সন্ধ্যাবেলার রক্ত-রঙ্গে মেঘগুলি ছোপাইয়া গিয়াছে। Statesman পত্রিকা যাহা চাহিয়াছিল, তাহা তবে এই ভাবেই অনুষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে!

দিন আসে, দিন যায়। একদিন সম্বাদ দেখিলাম, চট্টগ্রামে দাঙ্গা হইয়াছে। বেসরকারী ইংরেজ ও এ্যাংলোইন্ডিয়ানগণ তাহার নায়ক এবং উত্তেজিত মুসলমান জনতা সে-riot-এ তাহাদের সহকর্মী। আশানুল্লা-হত্যার প্রতিশোধ চট্টগ্রাম সহরের উপর নেওয়া হইয়াছে। তারপর মেদিনীপুর তো রহিয়াছেই। ঢাকাও বাদ যায় নাই। প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ দুই পায়ে বাংলাকে চষিয়া ফিরিতেছিল।

এই সেই দিন। লর্ড সিংহ-রোডে ডাক পড়িলে ক্যজেই আমাদের মুখের ছবি অমন হইত।

আজ সময়ে সে-সব ঘটনা হালকা-ভাবেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে পারিতেছি। এমন কি লর্ড সিংহ-রোডে তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতা

বেশ ঠাট্টা রসিকতার খোরাক ও বস্তু হইয়াছে। এ নিয়া আলাপ ও গল্প করিয়া জেল-জীবনটায় আরাম উপভোগ পর্যন্ত করিতে পারিতেছি। দুঃখ পর্যন্ত শেষে হাসির খোরাক যোগায়—সময়ে সবই সম্ভব হয়।—

একজনের অভিজ্ঞতার কথা বলি।

লর্ড সিংহ-রোডে তার কৌতুককর অভিজ্ঞতা বলার আগে তার একটু পরিচয় দরকার।

নাম ফণীভূষণ দত্ত। রোগা-বাঙালীর দেশে এ-রকম শরীর ও স্বাস্থ্য বড় নজরে পড়ে না। মনে হয়—এ-দেশে এ-শরীর যেন বিধাতার আর্ষ-প্রয়োগ। অতবড় শরীর, চোখে-মুখে এমন একটি সজীব সরলতা রহিয়াছে যে, প্রথম-দর্শনেই আত্মীয়তার আকর্ষণ বোধ করা যায়। আর বিস্ময় লাগে যে, এই বয়সেও ঐ শরীরের আড়ালে একটি শিশু-মন টিকিয়া রহিয়াছে।

সঙ্গী-হিসাবে ফণীর যুড়ি নাই। কথা বলিবার নিজস্ব একটি ভঙ্গী তার আছে যা সাধারণের থাকে না। রস-জ্ঞান তীক্ষ্ন, নিজের রসিকতা-ঠাট্টা ইত্যাদিও মার্জিত ও সংযত। আলাপ-আলোচনা-আড্ডা এ-সব সরস ও সজীব করিয়া রাখিবার শক্তি তার প্রচুর। ঈর্ষা হয় যে, এমন-ভাবে বলিতে পারিলে অনেক দুঃখ-কষ্টই হালকা করিয়া লওয়া যাইত।

এ গেল তার এমন দিক যা বাহিরের লোকেরও জানিতে বেশী বিলম্ব হয় না। কিন্তু ফণীর আর একটা দিক আছে, যা সাধারণ দৃষ্টির বাহিরে। সে তার কষ্ট-সহিষ্ণু দৃঢ় দিক—যা ভাঙা যায়, কিন্তু নোয়ানো চলে না!

দেউলীতে একদিন কথা হইতেছিল অনিদ্রা-রোগ নিয়া। জেলে অনেকেই এ-রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন।

জীবন সরকার বলিল—"পঞ্চাদা' আপনি এত দেরীতে উঠেন কেন?"

পঞ্চাননবাবু কিছুক্ষণ হয় ঘুম হইতে উঠিয়া বিছানায় বসিয়া

ছিলেন, কহিলেন—“রাত তিনটার আগে ঘুম হয় না, কি করব। যা-একটু ঘুম আসে ভোরের দিকে।”

ফণী পঞ্চাননবাবুর পাশে বসিয়াই একটা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল, বোধ হয় সঙ্গীত-বিষয়ে কোন বিশেষ পুস্তক-ই হইবে। আস্তে কহিয়া উঠিল—“আমারও ইন্‌সম্‌নিয়া।”

শুনিয়া জীবন সশব্দে হাসিয়া উঠিল। বলার ভঙ্গীতে আমরাও হাসিয়াছিলাম। কিন্তু জীবনের হাসির সঙ্গে আমাদের হাসির তফাৎ ছিল, তা পরে বুঝিলাম।

জীবন কহিল—“ফণীবাবু, আপনার সেই ইন্‌সম্‌নিয়ার গল্পটা বলুন না।”

পঞ্চাননবাবু চাপিয়া ধরিলেন—“বলতো গল্পটা।”

—“না, সে তেমন কিছু নয়। একদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিলাম, এখন দেখছি ভাল করিনি! গোপন কথা যত কম বলবেন ততই উপকার পাবেন।”

শেষের উপদেশটি জীবনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইল।

পঞ্চাননবাবু জানালার দিকে ঝুঁকিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাক দিলেন—“এই মণ্ডল।”

সামনেই চৌকা, কয়েকজন ফালতু বঁটী পাতিয়া তরকারী কুটিতেছিল। মোটাসোটা বেঁটে হরষিত-মণ্ডল উঠিয়া আসিয়া জানালার ওধারে দাঁড়াইল।

কহিল—“বাবু, ডাক্‌তিছেন?”

—“হাঁ, ডাক্‌তিছি। ক' কাপ চা আন্‌তে পার?”

—“পারি। ক' কাপ?”

—“এই চার পাঁচ কাপ।”

ফণী জিজ্ঞাসা করিল—“মোণ্ডল, তোমার বুঝি শরীর ভালো নেই। নিশ্চয় মৌতাত জোটে নি?”

মণ্ডল হাসিয়া ফেলিল। সে চরস-সেবা করিয়া থাকে, বাবুদের কাছে এটা গোপন নাই।

কহিল—"না বাবু, আজকাল পাই। কিন্তু পয়সা বড় বেশী লাগ্‌তিছে।

—"তা তো লাগবেই মোণ্ডল, এ যে জেলখানা। কিন্তু মৌতাত পেয়েও তুমি এমন কথা বল্‌ছ?"

কি কথা—বুঝিতে না পারিয়া আমরাও তাকাইয়া রহিলাম।

ফণী কহিল—"তা না হলে তুমি শুধু চা আনতে চাও।"

বুঝিতে পারিয়া মণ্ডল হাসিয়া ফেলিল। কহিল—"এত বেলায় যে টিফিন কিছু আছে তা তো মনে হয় না। দেখি, কি পাই।"

—"কিছু না থাক ডিমতো আছে? মামলেট হলেও চলবে। বেশী না, গোটা ছয়েক। তুমি কেমন ওস্তাদ আজ দেখা যাবে।"

পঞ্চাননবাবু কহিলেন—"ম্যানেজার-বাবুকে গিয়ে আমার কথা বল। কিছু খাবার আর চা, বুঝলে?"

বুঝিয়া হরষিত-মণ্ডল প্রস্থান করিল। পঞ্চাননবাবু ফণীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"কই, তোমার গল্প বল্লে না?"

—"দুঃখ হয়, সে-রকম ইন্‌সম্‌নিয়া আজকাল আর নেই। উঃ—সে কী দিনই গেছে।"

তারপর তার 'সেই-সে-দিনের' গল্প শুরু করিল।

ফণী তখন কলিকাতাতে মুক্তারামবাবু-স্ট্রীটের দিকে থাকিত। সময়টা গ্রীষ্মকাল, কিন্তু মাঝে মাঝে বর্ষা গ্রীষ্মের এলাকায় অনধিকার-প্রবেশ করিয়া আক্রমণ করিয়া থাকে।

বদ্ধঘরের ভিতর শোয়া ফণীর ধাতে সয় না—তায় এই গ্রীষ্মের গরম। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া একটা মাদুর ও বালিশ বগলে ফুটপাতে আসিয়া একটা জায়গা বাছিয়া বিছানা পাতিয়া সে শুইয়া পড়িত।

ঘুমের জন্য বেশী সময় সে নষ্ট করিত না। বিছানায় গা দিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে পারিত। চোখ বুজিলে শুধু অন্ধকারই আসিত না, ঘুম-ও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িত।

একটা গাড়ী-বারান্দার নীচে ফণী সে-দিন জায়গা বাছিয়া নিয়াছিল, রাত্রে বৃষ্টি আসিতে পারে এই আশঙ্কায়। পাশেই ফুটপাতের অন্যান্য

শরিক গরীব ভিখারীর দলও রাত্রের মত বিশ্রাম করিতেছিল। একটা কুকুরও পাশে আসিয়া জায়গা নিয়াছিল।

এক সময়ে একটা হৈ-হৈ শব্দ শুনিয়া ফণীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। চোখ মেলিবার আগেই কানে আসে—"গেছেরে গেছে।"

কোথায় কে গেল—দেখিবার জন্য ফণী চোখ মেলিয়া দেখিল, ইতিমধ্যেই প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। এইমাত্র ঘুমাইতে আসিল, আর শুইতে না শুইতেই রাত্র শেষ! না, শেষে মনে হইল—এগারোটার সময়ই সে শুইয়াছিল।

কিন্তু হৈ-হৈ ব্যাপারটা কিসের? পাশেই কয়েকটি ভিখারী জাগিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, সামনে রাস্তার উপর গঙ্গা-স্নানার্থী কয়েকটি বিধবা—তারাই হায়হায়-চীৎকার করিতেছিল। ফণী কিছু বুঝিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিল।

তাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া বিধবাদের একজন কহিল—"খুব বেঁচে গেছ বাবা! লাগেনি তো?"

ফণী জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া রহিল। 'বেঁচে গেছ, লাগেনি তো'—কিছুরই অর্থ সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

—"ষাঁড়ে যে তোমাকে মেরে ফেলেছিল।"

বিধবার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইল যে, একটা ষাঁড় কিছুদূরে ফুটপাত ধরিয়া মন্থর গমনে চলিয়াছে। পথের মধ্যে ফণী পড়িয়া যায়—পাশ না কাটাইয়াই ষাঁড়টি সোজা তার উপর পা ফেলিয়া গিয়াছে। এতক্ষণে ফণীর ব্যাপারটা মালুম হইল—এইজন্যই এরা এমন করিয়া চেঁচাইয়াছে।

বিধবাটি অবাক হইয়া কহিল—"বাবা বিশ্বনাথ রক্ষা করেছেন। ষাঁড়টি দেখ্‌ছি তোমাকে না মাড়িয়েই ডিঙ্গিয়ে গেছে।"

বাবা বিশ্বনাথের বৃষের এত দয়া! কিন্তু নিজের উরুর দিকে চাহিয়া দেখিল, ক্ষুরের চিহ্ন আঁকা, দাগ কাটিয়া বসিয়াছে। কহিল—"না, একটা পা বোধ হয় পড়েছিল। তেমন কিছু হয়নি।"

পাশের এক দোকানদার সবেমাত্র জাগিয়া বাহিরে আসিয়াছিল।

দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া পূব-দিকে সূর্যের উদ্দেশ্যে নমস্কারটা সারিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। ফণীকে চিনিত, কহিল—"আপনি কিচ্ছু টের পাননি?"

ফণী অপরাধীর মত হাসিয়া কহিল—"না।"

—"এতেও আপনার ঘুম ভাঙেনি?"

—"চেঁচামেচি শুনে জেগেছি। এখন মনে হচ্ছে, ঘুমের মধ্যে যেন একটা চাপের মত বোধ করেছিলাম।"

—"বোধ করেছিলেন?—অদ্ভুত! এমন ঘুমের কথা বাপের জন্মে শুনিনি, দেখাতো দূরের কথা।"

জখম হয় নাই জানিয়া গঙ্গা-স্নানার্থীরা চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ফণীর ঘুমের সহনশীলতা, যা বৃষের পদ-মর্দনেও টোল খায় না, তা নিয়া আশে-পাশে বেশ একটি আলোচনা চলিতে লাগিল।

ফণী মাদুর গুটাইয়া লইয়া চলিয়া আসিল। সে যেন মস্ত বড় একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে—এমনই তার মনে হইল। এই রকম ঘুম মানুষের শোভা পায় না—দশজনে এ ভাবটা তার মনে বেশ গাঁথিয়া দিয়াছিল।

পঞ্চাননবাবু একটু অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সত্যি, তুমি একটুও টের পাওনি?"

—"সত্যি। আশ্চর্য হয়ে যাই যে কেমন করে এ রকম হতে পারে। উরুতে ক্ষুরের দাগ স্পষ্ট রয়েছে, মাড়ায়নি বলে যে নিজেকে বুঝ দেব সে পথও ছিল না।"

তারপর হাসিয়া কহিল—"আজ বিশ্বেস হয়েছে যে, আমাকে খাঁটি ইন্‌সমনিয়ায় পেয়েছিল। তা না হলে এ-রকম—বুঝতেই পারেন।"

পর্দা সরাইয়া তিলক-সিং প্রবেশ করিল, হাতে চায়ের কেটলী ও খাবার। থালা হইতে দু'টা মামলেট তুলিয়া লইয়াই ফণী কহিল—"উঃ—বেটা, একেবারে আগুন নিয়ে এসেছে।"

জীবনও হাত বাড়াইয়া একটা মামলেট তুলিয়া লইল। কহিল—"আপনি যে দুটো নিলেন, এখন ভাগ হয় কি করে?"

—"নিজে না নিলেই বেশ ভাগ হয়, দুখানা করে দুজনে পান।"

পঞ্চাননবাবু কহিলেন—"আমি চা খাব। তুমি মামলেট নেও।"

জীবন প্রস্তুত ছিল না, ফণী হাত বাড়াইয়া পঞ্চাননবাবুর ভাগের মামলেট তুলিয়া নিল। জীবন পারিলে যুদ্ধ-ঘোষণা করিত। কিন্তু ফল কি হইবে জানা-থাকায় আর কোন চেষ্টা করিল না।

বিস্কুটের দিকে চাহিয়া ফণী কহিল—"জীবনবাবু, একটু অনুপান আনান না।"

—"না, আমি উঠতে পারব না।"

—"কোথায় আছে, তাই বলুন। উঠতে হবে না।"

—"বাঙ্কের উপর।"

অনুপান কি বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিলাম।

ফণী ডাকিল—"এই তিলক।"

তিলক কাপ ধুইয়া ভিতরে ঢুকিল।

—"যা তো—মাখনের কৌটাটা নিয়ে আয়। বাবুর বাঙ্কের উপর আছে।"

তিলক বাঙ্ক কি বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোন বাবুর বাক্সে আছে?"

—"আরে বাক্সে নয়, বাঙ্কে।" তারপর তাকে বাঙ্ক কি বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

—"যা, জলদি আসিস।"

চায়ে চুমুক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ফণী, দাঁড়িয়ে ঘুমুতে পার?"

—"ঘোড়ার মত? না—প্রাক্‌টিস্ করিনি। তবে ক্লাশে বসে বসে অনেক ঘুমিয়েছি।"

পঞ্চাননবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি চা খাবে না?"

—"না, ও-তে পদার্থ নেই। পঞ্চাদা', ইন্‌সম্‌নিয়ার আর একটা গল্প শুনুন।"

—"কার গল্প?"

—"আমারই। জীবনবাবুদের বলিনি। ঐ গাড়ী-বারান্দার নীচেই শুয়ে ছিলাম। ষাঁড়-pass করার কয়েকদিন পরের কথা। বেশ আরাম করে ঘুমিয়ে ছিলাম। এক সময় মনে হল, পা থেকে কোমর অবধি আমার বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এত অবশ ও ভারী ঠেকছে যে কিছুতেই পা টানতে পারিনে—পা দুটো যেন আমার নয়। অথচ সে-পায়ের জন্যই এত যন্ত্রণা বোধ করছি। এ-রকম নিশ্চয় আপনারাও ঘুমের মধ্যে টের পেয়ে থাকবেন। খুব জোর করে পা টানতে গেলাম—ঘুম ভেঙেগ গেল, চম্‌কে উঠলাম। দেখি, পা থেকে কোমর অবধি জলে ডুবে আছে।"

—"জলে ডুবে গেছে?"

—"হাঁ। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। রাত্রে বৃষ্টি হয়ে রাস্তা ডুবে যায়, তারপর ফুটপাত পর্যন্ত জল আসে। কখন কোমর অবধি জলে ডুবে গেল—ঘুমের মধ্যে এই কাণ্ড। এত ঠাণ্ডা আমি কোনদিন টের পাইনি, যেন অর্ধেকটা শরীর বরফ হয়ে গিয়েছে—এমনই লাগল।"

জীবন কহিল—"জলের ছাটেও ঘুম ভাঙেগনি?"

—"কথা শুনলেন?—বল্‌ছি, জলে ডুবে গিয়ে ঘুম ভাঙেগনি। আর উনি জিজ্ঞাসা করছেন, জলের ছাটেও ঘুম ভাঙেগলো না। গলা পর্যন্ত জল এলেও ভাঙগত না—শুধু নাকটা জেগে থাকলেই হোত। কিন্তু এমন অদ্ভুত ঠাণ্ডায় জীবনে ভুগিনি!"

কহিলাম—"ঘুমে তুমি সিদ্ধি লাভ করেছ!"

—"না, জেলখানায় এসে আত্ম-বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে। এ-ইন্‌সম্‌-নিয়ার দেখা আর এ-জীবনে পাব না। এখন হাতে এত সময়—অথচ তার দেখা পাই না। দরকারের সময় দেখবেন কোন জিনিস পাবেন না। আর যখন দরকার নেই—তখন দেখবেন বোঝায়-বোঝায় এসে হাজির! কি যে নিয়ম এ-পৃথিবীর!"

ঘরের মধ্যে কে ডাকিয়া বলিল—"পর্দা তুলুন, আ-গিয়া।"

—"এর মধ্যে রোল কল এসে গেল"—বলিয়া জীবন উঠিয়া পর্দাটা

তুলিয়া দিল। বুটের শব্দ করিতে করিতে ও-ধারের দরজা দিয়া সিপাই ও রোলকল-অফিসার ঢুকিল, হাতে রেজিস্টার খাতা ও লাল-নীল পেন্সিল। প্রত্যেক সিটের সামনে থামিয়া খাতায় দাগ দিতে দিতে আমাদের সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কহিল—"ফণীবাবু, ঘরে যাবেন না?"

—"ঘরেই তো আছি। আর হাঙ্গামা করেন কেন? এখান থেকেই দাগ মেরে দিন। পালাইনি—বিশ্বাস করবেন।"

লোকটি নিরীহ ও ভদ্রমানুষ, পুলিশের মেজাজ ও স্বভাব এখনও আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। হাসিয়া কহিল—"নিয়ম জানেন তো—"

—"তা আবার জানিনে। জান দিতে পারি, কিন্তু নিয়ম ভাঙতে পারি না, তা জানেন?"

অফিসারটি হাসিয়া ফেলিল। পঞ্চাননবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল—"আমাদের পিছনেও"—বলিয়া বাকী বক্তব্যটা চোখ ও মুখের ভাবে বুঝাইয়া দিল। পুলিশের লোক হইয়াও সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়, কোথায় কে কি-রিপোর্ট করিয়া বসে। এ গোয়েন্দার জাল এমনই ছড়াইয়া ফেলা হইয়াছে।

লোকটি নাম ডাকিয়া বাহির হইয়া অন্য ঘরের দিকে গেল। জীবন হাত বাড়াইয়া পর্দাটা টানিয়া নামাইতেছিল, দেখিল খাতা হাতে অফিসারটি আবার দরজার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাকিয়া কহিল—"ফণীবাবু, আপনার একটা অর্ডার এসেছে।" বলিয়া সিপাহীর হাত হইতে ফাইলটা নিয়া একটা কাগজ বাহির করিল।

কহিল—"এটা সই করে অফিসে পাঠিয়ে দেন যেন। যার যার একাউন্ট থেকে টাকা যাবে তাদের সই দিতে ভুলবেন না।" জীবন অর্ধ-উত্থিত অবস্থায় ছিল, পর্দা ছাড়িয়া কাগজটার জন্য হাত বাড়াইয়া কহিল—"কিসের অর্ডার দেখি।"

ফণী তার আগে ছোঁ-মারিয়া কাগজটা নিয়া বাহির হইয়া গেল।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল—"ফণীবাবু, কিসের অর্ডার?"

ফণী না-থামিয়াই উত্তর দিল—"বোমার।"

অফিসারটি হাসিয়া কহিল—"গ্রামোফোন-কোম্পানীর অর্ডার। একটা গ্রামোফোন আন্তে দেন্নি? সেটা এসেছে।"

জীবনও ফণী-দত্তের অনুসরণ করিল। যন্ত্রটা যাতে এখনই আনা যায় তারই চেষ্টা করিতে বলিল।

এই ফণী দত্ত।

গ্রেপ্তারের পর লর্ড সিংহ-রোডে নীত হয়। সেখানে গিয়া ফণীর মনের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। আর ভালো থাকার কথাও নহে। এখানকার ব্যাপার সম্বন্ধে যাহা শোনা যাইত, তাতে উৎসাহিত হইয়া উঠা চলিত না।

সময়টাও ভালো ছিল না। ঢাকায় গিয়া Lowman-সাহেব গুলিতে নিহত হইয়াছেন; টেগার্ট-সাহেবের উপর ডালহৌসি স্কোয়ারে বোমা ছোড়া হইয়াছিল, করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় তিনি ফসকাইয়া গিয়া রক্ষা পাইয়াছেন, বিপ্লবীদের একজন নিজেদের নিক্ষিপ্ত বোমায় মারা গিয়াছেন।—বাংলার আকাশে তখন ঝড় ছিল।

এ-দিনে লর্ড সিংহ-রোডে যাইতে হইলে মন খারাপ হইয়া পড়া অসঙ্গত নয়। সেখানে আদর-আপ্যায়নের যে সব ব্যবস্থা হইত বলিয়া শোনা যাইত, তাতে গায়ে-কাঁটা দিত—কিন্তু তা আনন্দে নয়। অন্তিম-কাল আসন্ন হইয়াছে, মনে মনে এ-জন্য প্রস্তুত হইয়া যাওয়ার দরকার সবাই বোধ করিত।

আমাদের শায়েস্তা করিবার কাজে যিনি সব চেয়ে প্রসিদ্ধি ও দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁর সম্মুখে ফণীকে আনিয়া দাঁড় করানো হইল। এ-বিষয়ে ভদ্রলোকটি—ভদ্রলোক বলিতে দ্বিধা হয়—প্রকৃত অধিকারী-পুরুষ ছিলেন। নাম ধরুন গিয়ে—থাক্, নামে আর কাজ নাই, কর্তামশায় বলিয়াই কাজ চালানো যাইবে।

টেবিলের সম্মুখে কর্তামশায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। ফণীকে দেখিয়া চোখ তুলিলেন, ঘাড় উঁচু করিবার প্রয়োজন বোধ

করিলেন না। দৃষ্টির ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে বাকী থাকেনা যে, অনেক অভ্যাসে এ স্টাইল আয়ত্ত হইয়াছে, সহজ সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ও-চোখে আর কোনদিন দেখা যাইবার সম্ভাবনা নাই। ভয়ানক লোকের সম্মুখে আজ সে আসিয়াছে, আলাপ-ব্যবহারের আগেই শুধু চোখের চাউনি দেখিয়াই ফণী বুঝিতে পারিল—মানুষের পরিচয় তার চোখেই লেখা থাকে, এ অতি খাঁটি কথা।

ফণী চেয়ার টানিয়া বসিল। ঠিক করিল, বোবার যখন শত্রু নাই, তখন সম্ভব হইলে চুপ করিয়াই থাকিবে, বিশেষ কোন কথাবার্তা কহিবে না। কি জানি, কোন্ কথায় কি ফল ফলিয়া বসিবে।

কর্তামশায় প্রশ্ন করিলেন—"নাম কি?"

যার যা স্বভাব, সে তেমন ভাবেই চলিবে। খোদার উপর খোদাগিরি করা চলে শুনিয়াছি, কিন্তু স্বভাবের উপর হাত চালাইবার কথা আজ পর্যন্ত শুনি নাই। বুদ্ধি করিয়া বড়জোর স্বভাব-পরিবর্তনের ইচ্ছা ও চেষ্টা করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই—যে-স্বভাব সে-স্বভাবই থাকিয়া যায়। পূর্বগামীরা স্বভাবকে অঙ্গারের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, যত জলেই ধোয়া যাক তার রং নাকি মোছে না। অবশ্য আগুনে দিলে কালো অঙ্গারও লাল হয়, কিন্তু মানুষের স্বভাবে লাগাইবার মত আগুন কিছু আছে কি?

ফণী বোবার পার্ট প্লে করিবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু পারিল না। কারণ তার ঐ স্বভাব। স্বভাবের মধ্যে যে রসিক লোকটি রহিয়াছে, সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে রাজী হইল না।

কাজেই ফণীকে জবাব দিতে হইল—"শ্রীফণী দত্ত।"

কর্তামশায় 'শ্রী' শুনিলেন, চোখ-মুখের ভাব বিশ্রী করিয়া তা অগ্রাহ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দত্ত?"

ফণী নিজেকে সংযত করিয়া লইল, কহিল—"ফণী দত্ত"।

—"হু"—কর্তামশায় নামটা বিশ্বাস করিলেন, না সন্দেহটা ঐ ভাবে মুক্ত করিলেন বুঝা গেলনা।

—"বাড়ী কোথায়?"

—"মাদারীপুর।"

—"যত শালা বাঙ্গাল এসে জুটেছে—"

জিহ্বা শাসন মানিল না, ফণীর মুখ দিয়া বাহির হইল—"যা বলেছেন"।

—"মানে?" উচ্চারণে জোর ছিল না, কিন্তু কর্তামশায়ের চাপা-কণ্ঠের প্রশ্ন ফণীর কানে বোমার ধমকের মত শুনাইল।

ফণী যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল, কহিল—"ঠিকই বলেছেন। এই বাঙ্গাল ব্যাটারাইতো দেশের পিছনে লেগেছে। সুখে থাকতে ওদের ভূতে কিলায়।"

কর্তামশায় বোধ হয় মনে মনে খুব একচোট হাসিয়া থাকিবেন, তাই নিজের এ দুর্বলতায় চটিয়া গিয়াছিলেন। নহিলে পরের কথাগুলি আসে কেমন করিয়া -"দেখ, এ-হাতে অনেক লোক সোজা হয়ে গ্যাছেন, তুমি তো কোন চুনো-পুঁটি।"

ফণী চুপ করিয়া রহিল। চুনো-পুঁটি বলিয়া চিনিয়াছেন, এখন অখাদ্য বলিয়া যদি ত্যাগ করেন, তবে এ-যাত্রা সে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু বড়র চরিত্র বড়ই জটিল, হয়তো এই বড় ব্যক্তিটির রুই কাতলার দিকে তত ঝোঁক নাও থাকিতে পারে, চুনো-পুঁটিতেই হয়তো এর রসনায় বেশী রস আসিয়া থাকে।

-"চুপ করে থাকলে চলবে না, যা জান সব খুলে বল, যদি বাঁচতে চাও।"

—"বেশ, জিজ্ঞেস করুন, কি জানতে চান?" ভাবখানা এই যে, নির্দোষী কেন প্রশ্নকে ভয় করিতে যাইবে, যার মনে পাপ আছে সে-ই কাঁপুক।

তারপর চলিল প্রশ্নের পালা। প্রথম প্রশ্ন শুনিয়া ফণী উত্তর দিল যে, সে কিছু জানে না। দ্বিতীয় প্রশ্নেরও সেই একই উত্তর দিল। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরেও ফণী তার অজ্ঞতা নিবেদন করিল। এর পরেও যখন প্রশ্ন আসিতে লাগিল, তখন ফণী থামাইয়া দিয়া কহিল—"খামোকা প্রশ্ন করে পরিশ্রান্ত হচ্ছেন। যে-জাতীয় প্রশ্ন করছেন,

তাতে আমার উত্তর "না", এটা আপনি এখন অনায়াসে ধরে নিতে পারেন।"

—"আচ্ছা, উত্তর পাওয়া যায় কি না, দেখব। কত 'না' 'হাঁ' হতে দেখলাম। সবাই প্রথম প্রথম ও-রকম গোয়ার্তুমি দেখায়—জানিনা। শেষটা দেখেছি সবই জানে। দেখতে তো ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের মত উত্তর কয়টি দিয়ে দাও দেখি।"

ফণী শেষেরটুকু বাদ দিয়ে আগের অংশের পদ-পূরণ করিল—"ছোটকালে দেখতে আরও ভালো ছিলাম, মা বলেছেন।"

কর্ত্তামশায় কহিলেন—"রস দেখি ধরে না। ও রস-টস কিছুই থাকবে না, কমিয়ে দিচ্ছি।"

ফণী রসের ব্যামো হইতে আরোগ্য হইবার প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল।

—"চেহারাটা তো দেখছি গুণ্ডার মত, গায়ে বুঝি খুব জোর?"

ফণী হতাশ হইয়া কহিল—"খুব জোর থেকে আর লাভ হোল—কৈ?"

হঠাৎ কর্ত্তামশায় চেয়ারে খাড়া হইয়া বসিলেন, ধমক দিয়া উঠিলেন—"নে ওঠ্, বৈঠক নে।"

ফণী বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বৈঠক?"

—"হাঁ, ডন-বৈঠক। নে, উঠে দাঁড়া।"

ফণী উঠিয়া দাঁড়াইল না, বসিয়াই প্রশ্ন করিল—"কটা?"

—"কটা নিতে পারিস?"

—"আপনি কটা বলেন?"

—"আমি? আমি তো বলি দু'শ'। পারবি?"

—ফণী হাসিয়া ফেলিল।

—"হাসছিস্ যে?"

—"হাস্ছি, দু'শ'—সে তো দশ বছরের ছেলে-ও পারে?"

—"দশ বছরের ছেলে-ও পারে! তুই ক'শ' পারিস্ শুনি?"

—"আপনার শ্রীচরণের আশীর্বাদ হোলে একসঙ্গে দেড় হাজার।"

—"দে-ড় হাজার? গামাকে হার মানালি দেখছি। যে গুন্ডার মত শরীর, পারতেও বা পারিস। এই—"

হাঁক শুনিয়া দরজার পাশে সিপাই চমকাইয়া উঠিল, কাছে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—

—"হুজুর।"

সিপাই কাছে গিয়া হুজুরের হুকুম মত ফণীকে টানিয়া তুলিতে হাত ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল। আড়াই মণ দেহ-ভারের নোঙ্গর ফেলিয়া ফণী চেয়ারে আটকাইয়া রহিল. সিপাহীর আকর্ষণে বিন্দু-মাত্র টলিল না।

সিপাই কহিল—"উঠুন।"

কিন্তু আকর্ষণে যে টলে নাই, অনুরোধেও সে অবিচলিত রহিল।

কর্ত্তামশায় কহিলেন—"আর একজনকে ডাক।"

ডাক পাইয়া আর একজন আসিল, দুই সিপাহী একযোগে দুই বাহু-মূলে হাত রাখিয়া ফণীকে ধরিয়া বিস্তর চেষ্টার পরে দাঁড় করাইল। কিন্তু তারা ছাড়িয়া দিতেই ফণী স্প্রিং-এর মত গুটাইয়া বসিয়া পড়িল।

কর্তামশায় যেন একটা খেলা পাইলেন, কহিলেন—"ছেড়ে দিচ্ছিস কেন? নে, টেনে তোল্, বৈঠক নেওয়াবি।"

সিপাহীরা পূর্বের মতই অধ্যবসায়ের জোরে অবশেষে দাঁড় করাইল, তাহাকে ধরিয়া নিজেরাও পাশে দাঁড়াইল। এখন বৈঠক লইবার পালা উপস্থিত হইল। কিন্তু বৈঠক লইতে আর হইল না। বেয়ারা আসিয়া সেলাম দিয়া জানাইল, সাহেব সেলাম দিয়াছেন। সাহেবের সেলাম -কর্তামশায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কহিলেন—"যা, সেলে নিয়ে রেখে দে। কাল দেখব, তুমি কিছু জান কি না।"

কর্তামশায় চলিয়া যান দেখিয়া ফণী তাড়াতাড়ি আবেদন জানাইল —"আমার খাবার কথাটা বলে দিন। না খেয়ে আমি বৈঠক নিতে পারব না বলে রাখলাম।"

কর্তামশায় সিপাহীদের কহিলেন—"এই, বাবুর খাবারের বন্দোবস্ত করে দিস। কি খাবে? রুটি? ক' ডজন লাগবে? দেড় হাজার বৈঠকের জন্য দেড় ডজনের কমে কি হবে?—যা, নিয়ে যা।"

সিপাইদের সঙ্গে ফণী বারান্দায় আসিল। সন্ধ্যা হইতে তখন বড় বেশী বাকী নাই। সূর্য দেখা যায় না, পশ্চিমের গাছপালা বাড়ী-ছাদ ইত্যাদির আড়ালে সে নামিয়া গিয়াছে। আকাশে সন্ধ্যার লাল-রং অস্তগামী-সূর্যের আজিকার মত কাজ ফুরাইয়াছে জানাইয়া দিতেছে। সামনে আসন্ন রাত্রি। কলিকাতার আকাশও রাত্রির জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এ আকাশে-ও অন্ধকারের সঙ্গে দলে-দলে তারা দেখা দিবে, সারা-রাত্র মহা-শূন্যে তিমির-উৎসব চলিবে, যতক্ষণ না পূর্বদিকে সূর্যের মাভৈঃ আলোক-আশ্বাস আসিবে।—আজিকার এই অবসন্ন পরাজিত সূর্যই আবার নূতন দিন নিয়া দেখা দিবে।

ফণীর চমক ভাঙ্গিল, সিপাই বলিল—"চলুন বাবু।"

"চল"—বলিয়া ফণী সিপাহীদের সঙ্গে চলিল।

পাশাপাশি কয়েকটি কুঠরি, সিপাই পাহারা দিতেছে—ভিতরে লোক আছে বুঝা গেল। একটি কুঠরির ভিতরের অধিবাসীকে দেখা গেল, দরজার দিকে পিছন দিয়া ও-ধারের দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে, হাত দু'টা উপরের দিকে তোলা। বাহিরে থাকিতে ব্যায়াম করার অভ্যাস বোধ হয় ছিল, এখানে আসিয়া সে অভ্যাস বজায় রাখিতেছে। ফণী মনে মনে না হাসিয়া পারিল না, মানুষ এমনই অভ্যাসের দাস, নইলে পুলিশের এই বন্ধ খাঁচায় ঢুকিয়া exercise করিতে উৎসাহ থাকে কেমন করিয়া! মনের চিন্তা হঠাৎ মোচড় খাইয়া ভিন্ন লাইনের উপর পলকের জন্য সার্চ-লাইট ফেলিয়া গেল—সত্যই exercise করিতেছে, না আর কিছু।

ফণী আগাইয়া চলিল, চিন্তাটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল—যে যার আপন ভাগ্যের সঙ্গে বোঝা-পড়া করিয়া লউক, অপরের ব্যাপারে তার এ মাথা-ব্যথার দরকার মোটেই নাই।

সামনের সেলে একটি অল্প-বয়স্ক ছেলে কম্বলে পড়িয়া

ঘুমাইতেছে, দেখা গেল। ঘুমের এমনই প্রয়োজন হইয়াছে যে, সময়-অসময়ের ধার ধারে না, সন্ধ্যাবেলাও ঘুম চলিতেছে। ঘুমাও, সব কিছু ভুলাইয়া দিতে এমন জিনিস আর নাই। কিন্তু এই শৈশবেই মনে ওর এমন কি হইল যে, ঘুমের বিস্মৃতির প্রয়োজন দেখা গেল!

থাক্, অন্যের ঘুমের মধ্যে নিজের চিন্তাকে হেতু-অন্বেষণে পাঠাইবার কোন প্রয়োজন নাই, নিজের কুঠরীতে গিয়া এখন ঢুকিয়া পড়। ফণী সেলে ঢুকিল, দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

ব্যস্, নূতন-জগতের বাসিন্দা সে এখন। এ কী মানুষের জগতেরই একটা অংশ? যে-আকাশ কিছুক্ষণ আগে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সে দেখিয়া আসিয়াছিল, এই অন্ধকার আবদ্ধ-শূন্যতায় তার কোন অস্তিত্ব আছে কি? আকাশ কি আটকা পড়িয়া বহুপূর্বেই এখানে মরিয়া শুকাইয়া কঙ্কাল হয় নাই? মানুষের আকাশ হইতে অবকাশ লুণ্ঠিত হইয়াছে, আলো চুরি গিয়াছে--তবু ঘটাকাশ মহাকাশেরই আত্মীয়? মিথ্যা প্রচার করিয়াছ—প্রতারকের দল। আত্মা আত্মহত্যা করিয়াছে—অমৃতস্য পুত্রাঃ সে নয়, হইতে পারে না। উন্মত্ত দানবের বিকারের দুঃস্বপ্ন হইতে প্রলাপের মত তোমরা আসিতেছ।—উঃ, কি অন্ধকার! বাতাস যেন অন্ধকারের চাপে জমাট হইয়া আসিতেছে।—

একা জাগিয়া বসিয়া আছি। পাশের খাটগুলিতে বন্দী-বন্ধুরা ঘুমে অচৈতন্য, অতল অন্ধকারে তারা তলাইয়া গিয়াছে। রাত্রি মধ্য-প্রহরের সিংহদরজা পার হইয়াছে, উপরে তারার আলোগুলি মহাশূন্যে জ্বলিতেছে। লণ্ঠন-হাতে পুকুরের ও-পাড়ে জেলের সিপাই পাহারা দিতেছে—অন্ধকারের অন্ধ অনুচর।

সব আলো যদি নিভিয়া যায়, কোথাও যদি এক-ফোঁটা আলো না থাকে—তবে কি সব অন্ধকার হইয়া যাইবে? তখন কি অন্ধকারের কোন দ্রষ্টা থাকিবে না? এতকাল জানিয়া আসিয়াছি, আলো না-দেখাই অন্ধকার দেখা, তাই চোখ বুজিলেই অন্ধকার আসে। কিন্তু এ-ভাবে নয়, একান্ত অন্ধকারকেই দেখিতে পারা যায় মনে হইতেছে—যেমন

আলোককে দেখা যায় ঠিক তেমনি। আলো অন্ধকার দুইই দেখার বস্তু, দ্রষ্টা বা দর্শনের সঙ্গে বোধ হয় এর কোন যোগ নাই। এই আলো-অন্ধকার উভয়কেই প্রকাশ করে, সে-আলো তবে কোথায় থাকে? বাহিরে তাহা নাই, তা জানি। কিন্তু বাহিরের এই আলো-অন্ধকারের হাত এড়াইয়া কেমন করিয়া যে সে-ভিতরটায় যাওয়া যায় বুঝিতেছি না।

শুধু পিপাসাই রহিয়া গেল, সে গোপন আলোককে কি কেহ কোনদিন প্রকাশ্যে বাহির করিয়া আনিতে পারিবে না?—চোখ মেলিয়াই অসহায়ের মত অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া আছি।

রাত্র গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে। দূরের রাস্তায় হর্ণ বাজাইয়া মোটর ছুটিয়া গেল। আলিপুরের পশুশালায় বাঘ ডাকিয়া উঠিয়াছে—খাঁচায় থাকিয়া ঘুমের মধ্যে বোধ হয় বনের-স্বপ্ন দেখিয়াছিল।

জেল-গেটে ঢং করিয়া শব্দ হইল। রাত্রি একটা বাজিয়াছে।

আমাদের কবি বলিয়াছেন—'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।'—জেলখানায় আসিয়া এ-জিনিসটির প্রকোপ বড় বেশী দেখিতেছি। বাহিরে থাকিতে বহু-রকম মানুষের সঙ্গে কারবার করিতে হইয়াছে, ছোট-বড় নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বহু-ব্যস্ততার মাঝে নিজকে নিয়া দু'দণ্ড বসিবার ফুরসৎ মেলে নাই।

কিন্তু এখানে অবসর প্রচুর—অনেকের নিকট তা' অসহ্য। এই অবসর নিয়া তারা কি করিবে ঠিক পায় না—রীতিমত হাঁপাইয়া উঠে। এখন অবসর মিলিয়াছে, বাহিরের পৃথিবী দৃষ্টি ও সমস্ত মনোযোগ অবরোধ করিয়া নাই—সরিয়া গিয়াছে। মস্ত-বড় একটা অবকাশের মধ্যে আমাদিগকে আমরা ছাড়া পাইয়াছি। এবং আপনকে ঘিরিয়াই ঘুরিতেছি।

কিন্তু এই আমি-বস্তুটি কি—তা' সঠিক বা বেঠিক কোনটাই আমি অন্ততঃ জানিতে পারি নাই। চেষ্টা করি নাই—তা' বলিতে পারি না, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারিতেছি না। নিজেকে নিজে ধরিতে পারিতেছি না। ব্যাকরণের-ভাষায়, কর্তাকে কর্ম-হিসাবে কিছুতেই প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না। যে-বস্তু দিয়া ধরিব—সে হইল আমার নিজের ইন্দ্রিয়। তার সম্মুখে যাহা থাকে, তাহাই সে ধরিতে পারে, গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের যিনি কর্তা তিনি সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের পিছনে থাকেন, ইন্দ্রিয়ের মুখ কখনও তার দিকে ফিরানো যায় না। ইন্দ্রিয় ঘুরিয়া হয়রাণ হয়—কর্তা কিন্তু সর্বদাই কেন্দ্রে থাকেন।

কোন কিছু জানা মানে তাকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়-বস্তু করা। ঐ করবার জন্য যে-কর্তাটির প্রয়োজন, সে জানার আদিতে থাকে, অন্তে মানে সম্মুখে থাকে না। সুতরাং আমি-বস্তুটিকে 'আমির' পক্ষে জানা-ক্রিয়ার কর্মরূপে-পাওয়া কখনও সম্ভব হয় না। ইন্দ্রিয়ের অতীত অতীন্দ্রিয়-করণ যদি কিছু থাকে যাতে 'আমি' নিজেই আমার কর্ম

হয়—তবে সে আলাদা কথা। শুনিয়াছি, সে-জন্য অধিকার থাকা দরকার করে। শুধু তাতেই হয় না—নিরন্তর সযত্ন-সাধনার বা অভ্যাসেরও একান্ত প্রয়োজন হয়। আমরা সাধারণ লোক—অধিকার বা সাধনা কোনটাই আমাদের আয়ত্তে নাই।

তবু আমরা 'আমাকে' ঘেরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি। এতকাল সংসারের সংঘর্ষের মাঝখানে ছিলাম, শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য পৃথক-ভাবে চেষ্টা করি নাই। লড়াই করিতে করিতে আঘাত পাইয়াছি ও দিয়াছি: এইভাবেই কাহারও শক্তি বাড়িয়াছে, কাহারও বা শক্তি হ্রাস হইয়াছে—এ ব্যতীত শক্তি-সঞ্চয়ের কোন পন্থা আমরা অনুসরণ করি নাই বা করিতে পারি নাই।

এখন নিজের সম্বন্ধে একটা হিসাব-নিকাশ করিতে অনেকেই ব্যস্ত আছেন। ইচ্ছা করিয়াই যে আমরা এ-কাজ করিতেছি—তা' নয়। এই দীর্ঘ অবসরের চাপে নিজে নিজের একান্ত-মুখোমুখী দাঁড়াইয়া পড়িয়াছি। তাই আপনাকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইতে হইতেছে—অন্য কোন দর্শন-যোগ্য বস্তুর অভাব হইয়াছে বলিয়াই। নিজের পরিচয় নিজের জানা দরকার—এ-কথা এই অবকাশ আমাদিগকে বিষম-ভাবে জানাইয়া দিতেছে। নিজের পরিচয় লইতে গিয়া অনেকেরই অস্তিত্বের ভিত্তি-মূলে নাড়া লাগিয়াছে। আমি নিজে সেই-অনেকের একজন।

আমার চেহারাটি ইচ্ছা করিলে আয়নার সামনে দাঁড়াইলেই দেখিয়া লইতে পারি। কিন্তু ভিতরের চেহারা দেখিব সে রকম কোন আয়না হাতের কাছে পাওয়া যায় না। যখনই নিজের সম্বন্ধে সজাগ হই, তখনই দেখিতে পাই যে, নিজের ইচ্ছা-কামনা ইত্যাদিতে নিজেকে প্রতিফলিত করিতেছি এবং নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-বাসনা ইত্যাদিও কখন একভাবে থাকে না, নিত্য এরা পরিবর্তিত হইতেছে। এই সর্বদা-পরিবর্তন-স্বভাব ইচ্ছাগুলির উপর আমার নিজের যে-প্রতিচ্ছবি পড়ে—তাহাও এক নহে, আমার সে ভিতরের রূপও কেবলই বদলাইয়া চলিয়াছে।

ফলে, মনে একটা বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা জন্ম নিয়া দৃঢ় হইতে থাকে যে, আমার হয়তো কোন স্থায়ী-রূপ নাই, হয়তো আমি এক-বোঝা বাসনা কামনার সমষ্টি মাত্র। জমানো-বরফ যেমন গলিয়া জলধারা হইয়া নামে, আমিও বোধ হয় ইচ্ছা-বাসনা সমূহে রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছি। মোটকথা, আমার চারিপাশে এমনই একটি পরিমন্ডল রহিয়াছে, যে-পরিমন্ডল কামনা-আকাঙ্ক্ষার নানা আলো বাতাসে তৈরী, যাহা অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া যাওয়াও যায় না, কিম্বা যাহা ঠেলিয়া পথ করিয়া কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়াও যায় না। যতবার যে-ভাবে যে-দিক দিয়াই চেষ্টা করিয়াছি, এই একই অভিজ্ঞতা কেবল লাভ করিয়াছি যে, 'আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে'।

নিজেকে জানবার-চেষ্টা যখন বারম্বার একই অভিজ্ঞতায় আসিয়া থামে, তখন সে-দিকের ব্যর্থ চেষ্টা হইতে বুদ্ধি নিবৃত্ত হয়, অন্তত হওয়া স্বাভাবিক ও উচিত। তখন দেখিতে পাই যে, বুদ্ধি যেন স্থির হইতে চায়, তার চঞ্চলতা কমিয়া আসিতে থাকে। আমার মনে হয় যে, তখন বুদ্ধির মধ্যে একটি উদ্বৃত্ত-জমি পাওয়া যায়—যেখানে স্থির হইয়া দাঁড়ানো চলে। ফলে, শক্তি-বৃদ্ধি হয় এবং তখন জীবন-সম্বন্ধে ব্যবহার দ্বিধা ও কুণ্ঠাশূন্য হইয়া আসে। এতে এই লাভ হয়, আনন্দ না-মিলুক শান্তি অন্তত পাওয়া যায়—যেখানে সুখ-দুঃখ আন্দোলন ও বিক্ষোভ না-তুলিয়াই তার দেয় যা তা দিয়া যায়।

এর কারণ আছে। যখন নিশ্চিন্ত জানা যায় যে, আমিকে ধরা সম্ভব নয়, মানে আমি আমার-বাহিরে যাইতে কখনই পারি না, পরিধি পার হইতেও পারি না বা কেন্দ্রে-লগ্ন হইতেও পারি না—তখন এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দৃঢ়-বিশ্বাস হইয়া সমস্ত অস্তিত্বে সংক্রামিত হয়। নূতন-তাজা রক্ত-বৃদ্ধি যেমন সবলতর স্বাস্থ্য আনে, এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও তেমনি নূতন-ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তোলে।

এ গেল নিজেকে জানার বিষয়ে যে-দিকটা অজ্ঞেয় বা অসম্ভব। আর বাকি থাকে পরিচিত দিকটা—যেখানে সংখ্যাহীন আশা-

আকাঙ্ক্ষার সমষ্টি আমি। বুদ্ধির স্থিরতা-লাভের পরে এইগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে তত বেগ আর পাইতে হয় না। নিজের জোরালো কামনাগুলিকে প্রাধান্য দিয়া disciplined organised করিয়া লইবার তাগিদ আসে তখনই। যে তাড়াতাড়ি তা' সারিয়া নিতে পারে—জীবনের ক্ষেত্রে ভাগ্যকে জয় করিয়া লওয়া তারই পক্ষে সম্ভব হয়। যদি মানসিক গঠন অনুকূল হয়, বহুর জন্য সফলভাবে আত্ম-নিয়োগ সেই ব্যক্তি-ই করিতে পারে। নতুবা নিজের ব্যক্তিগত জীবনকেই সুখী বা বড়-করিবার চেষ্টায় সে ব্যস্ত থাকে এবং সফল হয়ও। এ-সব ব্যক্তি চরিত্রবান বা মন্দ ইত্যাদি প্রশ্ন অবান্তর হইয়া পড়ে।

এতকাল নিজের সঙ্গে নিজ জীবন-যাপন করিলাম, অথচ সেই নিজেকে জানিতে পারি না—এ আমার কাছে বড় আশ্চর্য মনে হয়। জন্ম হইতে এই এত-দিন পর্যন্ত নিজেকে নিয়া কাটাইয়াছি, একটা ক্ষণও নিজে নিজের সঙ্গ-ছাড়া থাকি নাই—এ সত্ত্বেও আমারই কাছে আমি অজ্ঞেয় থাকিয়া যাইতেছি—একটু যখন মনোযোগ দিয়া ভাবিতে বসি, সত্যই এ আমার নিকট রহস্যময় লাগে। কেমনতর একটা অভূতপূর্ব-রসে মন আবিষ্ট হইয়া আসে।

আবার অনেক সময়ে একটা অন্ধ-আক্রোশেও উত্তেজিত ও অস্থির হইয়াছি। এই অস্তিত্বের-পর্দা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অন্তরালে কোন রহস্য রহিয়াছে, একবার দেখিয়া লইতে চাহিয়াছি। কিন্তু আমি আমার নিকট ভয়ানক-ভাবে বন্দী হইয়া রহিয়াছি, কোন-দিক দিয়াই মুক্তির সামান্য-তম ছিদ্র-পথ পর্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারি নাই। নিজেকে নিজে ছাড়াইয়া উঠিব, নিজের-অতীত একটি আশ্রয় পাইব যেখান হইতে নিজেকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইতে পারিব—এ আমার নিকট আজ পর্যন্ত অসম্ভব চেষ্টা হইয়াই রহিয়াছে। অসম্ভব, তবু মন নিবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। একটা কিনারা সে করিবেই, হার মানিবে না—মনের এই দৃঢ়তা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে এই দৃঢ়তা দৃঢ়তর হইয়া আসিতেছে। নিজের সত্য-পরিচয়

কি—এ না জানিয়া মন তৃপ্তি বা শ্রান্তি কোনটাই মানিবে না। আমি জ্ঞানতঃ কোন চেষ্টা না-করিলেও মনের এই চেষ্টা চলিতে থাকে—এও আমি লক্ষ্য করিয়াছি। নিজেকে জানা—হয়তো এ-অসম্ভব সম্ভব হইতেও পারে একদিন।

*　　　*　　　*　　　*

নিজের কথা ভাবিতে বসিয়াছি।—রাত্র প্রায় একটা বাজে। Corridor-এ ইলেকট্রিক-আলো জ্বলিতেছে—পর্দা ঠেলিয়া তা' ঘরে আসিতে পারিতেছে না। সিলিং-এ খানিকটা জায়গা সাদা আলো আসিয়া পড়িয়াছে। হারিকেন-লণ্ঠন জ্বালিয়া নিয়া লিখিতেছি। রাত্রির ও ঘুমের গভীর-স্তব্ধতা ও প্রশান্তি জেলখানায় ব্যাপ্ত হইয়া আছে। নিজেকে নিজের চিন্তার বিষয়-বস্তু করার এই তো উপযুক্ত সময়।

নিজের কথা কত যে ভাবিয়াছি—তার সীমা নাই। নিজেকে নিয়া কি করিব, কি করিতে পারিলে মন তৃপ্ত হয়—বুঝিতে চাহিয়াছি। কি হইতে পারিলে নিজের চরম প্রকাশটি লাভ করা যায় এবং তেমনটি কোন-পথ ধরিয়া চলিলে হইয়া-উঠা যায়—ভাবিয়া শ্রান্ত হইয়াছি। এই ভাবেই দিনের পর দিন পার করিয়া জীবনের এতগুলি বৎসর অতিক্রম করিলাম। আয়ুর পুঁজি তো ইতিমধ্যে অর্ধেকটা ক্ষয় করিয়া আনিয়াছি। যাহা কাম্য ছিল, তাহা কি ছিল,—বুঝিতে কি পারিয়াছি বা পাইয়াছি? যাহা হইয়া-উঠার লোভ ছিল—তাহা কি জানিতে পারিয়াছি বা হইয়া-উঠিয়াছি? কি-করিয়াছি এবং কি-হইয়াছি—এ-প্রশ্নের জবাব জীবনের মাঝামাঝি আসিয়াও দিতে পারিতেছি না।

নিজের আদি নিজে দেখি নাই, তা' সম্ভব নয় বলিয়াই—কারণ নিজের জন্মের-দ্রষ্টা নিজে হওয়া তো কখনও সম্ভব হয় না। নিজের শেষও নিজে দেখিতে পারিব না—কারণ নিজের মৃত্যুর-দ্রষ্টা নিজে হইব, সেও-তো অসম্ভব। আমার আদি থাকিলে আমি তা' জানিতাম, আমার অন্ত থাকিলে তাও আমার অজানা থাকিবে না—কারণ, যাহা আমার অভিজ্ঞতার বিষয় হয় না, আমার বিষয়ে তাহা কখনও ঘটে না।

চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারি—আমার আদি বা অন্ত কোনটাই নাই। কিন্তু এ যদি অভিজ্ঞতার বিষয় হইত, শুধু চিন্তার ও যুক্তির সীমায় আবদ্ধ না থাকিত, তবে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতাম। সীমাবদ্ধ খণ্ডিত-জীবনে আমার অসীমত্বের আস্বাদন পাইতাম। তখন বুঝিতাম—এক-দিকে আমি পরিবর্তনশীল ও অন্তবিশিষ্ট, অন্য-দিকে আমি শাশ্বত ও আদি-অন্তহীন। এই সীমায় ও অসীমে তখন ইচ্ছামত দোল খাইতে পারিতাম। কোন দুঃখ, কোন নালিশ, কোন জ্বালাই আর থাকিত না।—কি হইতে পারে, তা থাক। কি হইয়াছে ও হইতেছে—তাহাই আর একবার ভাবিতে বসি।—

কথাটা পুরানো কিন্তু সত্য। শৈশবে মানুষের জীবনে এমন কতকগুলি ছাপ পড়ে যা সমস্ত ভাবী-জীবনের গতি নির্দিষ্ট করে। যে-সমাজে আমরা বাস করি তার প্রভাব শিশু-মনে এমন দৃঢ় থাকে যে, তাহা ছাড়াইয়া-উঠা সম্ভব হয় না। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই প্রভাবগুলি সমস্ত কাজ-কর্মে ও চিন্তায় নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সমাজের চেয়ে যে-পরিবারে আমরা জন্ম-লাভ করি, লালিত ও পরিপুষ্ট হই, তারই প্রভাব বহু-গুণে বেশী প্রবল ও স্থায়ী। পরিবারের প্রভাব যে কত বড় হইতে পারে তার উদাহরণ আমার জীবনেই রহিয়াছে।

আমাদের পরিবারটি স্বদেশী পরিবার। সে 'স্বদেশী' উগ্র-পন্থী। স্কুলে নিচের ক্লাশে পড়ি, তখন এক দাদা ধরা পড়েন। গ্রামসম্পর্কে এক দাদা, আমাদের বাসাতেই থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন—তিনিও গ্রেপ্তার হন। গুর্খাপুলিশ-দারোগা-সাহেব ইত্যাদিতে বাড়ি বেষ্টন করিয়া রাজসিক সমারোহ ও দাপট দেখাইয়া গেল। সে-দিনের বালকের মনে যে-ছবি আঁকা হইল আজও তা মুছিল না। শুনিলাম বোমা-পিস্তল খুঁজিতে এরা আসিয়াছে। দাদারা নাকি সাহেব খুন করিবে, এ দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবে—তাই বোমা-পিস্তল যোগাড় করিয়া মজুত করিয়াছেন। এমন কি, দাদারা নাকি টাকার জন্য ডাকাতিও করিয়া থাকেন।

এক-দিনেই দাদাদের চেহারা বদলাইয়া গেল। যে ছিল আমার

দাদা—সে এক-দিনে অসামান্য হইয়া দেখা দিল, এমন কি অপরিচিত-প্রায়ের মত তাদের দেখিতে লাগিলাম। মানুষের এর চেয়ে বড় চেহারা সে-দিন আমার কল্পনায় আর ছিল না।

তারপর বালেশ্বর-লড়াইয়ে যতীন মুখার্জি মারা গেলেন, দুই দাদারই ফাঁসি হইল। জীবনে এই একটি ঘটনা সে-দিন ঘটিল—যার ফলে আমার জীবন আগা-গোড়া বদল হইয়া গেল। আমার আজিকার জীবন সেই ঘটনারই পরিণতি।

সেই মৃত্যুকে আমি বহন করিয়া চলিয়াছি এই দীর্ঘ দিন যাবৎ। বহন করিতেছি বলা ঠিক হইবে না—সেই মৃত্যু আমাকে ঠেলিয়া নিয়া চলিয়াছে এবং আজিকার দিন পর্যন্ত আনিয়াছে। বাকি দিন কয়টাও ঐ একই ইঙ্গিতে চলিতে হইবে, এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

শৈশবের প্রভাব জীবনের মূলে থাকিয়া কি-ভাবে গোটা জীবনকে চালিত করে, তাহা একটু লক্ষ্য করিলে আমার মত সবাই বুঝিতে পারিবেন। নানা-ভাবে নানা-দিকে ছুটিয়াছি, কিন্তু শেষটা সেই একই পথে আসিতে হইয়াছে। মনের রক্তে যাহা মিশিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া বৃথা চেষ্টা ও পণ্ডশ্রম হইয়াছে বহুবার দেখিয়াছি। ব্যক্তিগত লোভে কামনায় যে-পথেই পা বাড়াইয়াছি, সব পথই ঐ এক পথে আসিয়া মিশিতে দেখিয়াছি। শৈশবে অস্তিত্বের গোড়া-ঘরে যে মূলধন সে-দিন সে-মৃত্যু সঞ্চিত করিয়া দিয়াছে, যক্ষের মত আমি তা পাহারা দিতেছি, জীবনে সেই একমাত্র মূল-ধন সম্বলেই কারবার চলিয়াছে। অন্য সব দান গ্রাহ্য হইতে পারিতেছে না।

নিজের কথা বলা রুচি-সম্মত নয়—জানি। এও জানি, নিজেকে যে লোপ করিতে পারে, সে নিজের বৃহত্তম ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু নিজেকে সত্য-সত্যই লোপ করা সহজ নয়, যারা একটু চেষ্টা করিয়াছেন তাঁরাই তা টের পাইয়া থাকিবেন।

এ জানিয়াও নিজের কথা লিখিতেছি, এর একমাত্র কারণ আমি আর দশজনের মতই রক্ত-মাংসের মানুষ। মানুষের যে সব পতন-ত্রুটি

হইয়া থাকে, তা' আমারও অল্পবিস্তর হইয়াছে। সাধারণের মতই কোন কোন বিষয়ে বা কোন কোন সময়ে আমি ভয়ানক দুর্বল ও অক্ষম প্রতিপন্ন হইয়াছি। আবার তাদের মতই কোন বিষয়ে বা কোন সময়ে হয়তো চরিত্রে তেজের ও শক্তির পরিচয় দিয়াছি। আমার সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই, বিশেষ মোহ নাই—আমি জানি, আমি যে-স্তরের মানুষ সেখানে দুর্বলতা, অক্ষমতা এমন কি হীনতা পর্যন্ত নিত্যকার ব্যাপার।

একাকী থাকিতে হয়, সংগী-সাথীর অভাবে নয়, মনের স্বভাবের জন্য। সময় কাটাইবার জন্য এক রকম খেয়াল-বশেই কলম লইয়াছি, স্মৃতির পাতায় তা দিয়া দাগা বুলাইয়া চলিয়াছি। পড়াশুনা ইত্যাদির অবসরে রাত্র যখন একটু বেশী হয়, পাশের অন্যান্য ঘরে বাতি নিভাইয়া সবাই যখন ঘুমাইয়া পড়ে, তখন কলম নিয়া স্মৃতির পথ ধরিয়া চলি। চলিতে চলিতে সে-পথ যদি এক সময় আমার ব্যক্তিগত জীবনের দরজায় আসিয়া থামে—তবে পাশ কাটাইবার কোন কথা আমার মনে আসে না। যে-আমি একদিন ছিলাম, আজ আর নাই—সেই আমির দুয়ারে আজিকার আমি আসিয়া থামি। মৃত-আমিকে দেখিবার জন্য যদি দু'দণ্ড তার পাশে দাঁড়াইয়া যাই, তবে তাতে সত্যই দোষের কিছু থাকে কি যাতে রুচিতে আঘাত লাগিতে পারে? আমার তো মনে হয় না।—

সাত বছর আগে একদিন বেলা এগারোটার সময় গ্রেপ্তার হইয়া জেলে আসি। ভাইবোনরা সকলে এবং সহরের অনেকে জেল-গেট পর্যন্ত সংগে আসে। জেল-গেট বন্ধ হইলে তাহারা চলিয়া যায়। একটি ঘরে গিয়া নিজের জায়গা লই।

জেল আমার কাছে নূতন নয়। নূতন হইলেও যে মন বিশেষ চঞ্চল হইত, এ আমার মনে হয় না। ঢুকিবার মুখে ভাইবোনদের হাসি-মুখেই বলিয়া দিয়াছি যে—যা, ভাবিসনে, ছ'মাসের মধ্যেই ফিরে আসছি।—তখন ঐ রকম বিশ্বাসই ছিল।

মাদারীপুরের এ ছোট জেলে ঢুকিয়া মনে বিশেষ একটি ভাব

বেশ কতক্ষণ স্থায়ী ছিল, সাত বছর পরেও তা আজ মনে করিতে পারিতেছি।

দাদারা ষড়যন্ত্র-মামলায় ধরা পড়িয়া এই জেলে কয়েকদিন ছিলেন -- ১৯১৩ কি ১৪ সাল হইবে। স্কুলে যাইবার আগে রোজ বাসা হইতে তাঁদের খাবার এখানে পেঁাছাইয়া দিয়া যাইতাম। জেলের গরাদের পাশে তখন তাঁহারা আসিয়া দাঁড়াইতেন। এই ছবি মনে আসিতেছিল, আর এই কথাই মন ভাবিতেছিল—সেই দিনের সে-বালক আজ বড় হইয়া নিজে জেলে আসিয়াছে, এবার তার জন্যই হয়তো সন্ধ্যার সময় ছোট ভাইরা খাবার নিয়া আসিবে। এবং সে-দিনে গরাদের পাশে যাঁরা দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তাঁহারা আজ এ-পৃথিবীতে নাই, কে জানে কোথাকার অদৃশ্য-জানালায় দাঁড়াইয়া তাঁরা নীচের পৃথিবীর জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করিতেছেন। মনে একটু ভয়ের সঙ্গে কথাটা খেলিয়া গেল, তবে কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে? আজ যে-ভাইরা খাবার নিয়া আসিবে তারাও একদিন শেষে এই ভিতরে আসিবে এবং আমি পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িয়া সেই অদৃশ্য-বাতায়নের ধারে গিয়া দাঁড়াইব?—ঘরে তখনও আলো দিয়া যায় নাই। কিছুক্ষণ এই ভাবনাগুলিই মনকে দখল করিয়া ছিল— আজ তা স্মরণ করিতে পারিতেছি।

মাদারীপুরের জেলে দু-রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম, এ-কথাটা ভুলি নাই। আর মাদারীপুর ত্যাগ করিয়া আসার ছবিটিও মনে রাখিতে পারিয়াছি।

আমি কবি নই, কবিতা লিখিও নাই, কিন্তু সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি ও রুচি আছে। বিশেষ করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমার মন আকৃষ্ট হয়, কারণ তাতে আমার মনের তল-দেশ পর্যন্ত আলোড়ন পেঁাছায়। মানুষের মুখ, যত সুন্দরই হউক, আমাকে আকৃষ্ট করে না। যে-মুখ বা যে-অবস্থা বিশেষ ছবি ও রূপের প্রতীক হয়, বিশেষ ভাব বহন করে—তাহাতে অবশ্য মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বাহির পৃথিবী যে-অনায়াসে আমার মন টানিয়া লয়, যে-অবস্থার মধ্যেই

থাকি না কেন সরাসরি হৃদয়ের অন্দর-মহলে যেভাবে ঢুকিয়া পড়ে, তাতে অনেক সময়ই আমি ভাবিত হইয়া পড়িয়াছি যে, এ ভালো লক্ষণ নয়, গুরুতর কর্তব্য-পালনের সময় তো এরা বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারে। মনকে তৈরি করা কর্তব্য, বাহিরে সৌন্দর্যের ফাঁদ পাতা হইলেই যে ধরা-পড়ার বদ অভ্যাস—এ মনের ব্যাধি-বিশেষ, এর চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু আজও সে-রোগ সারে নাই, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়াছে। সুযোগ ও অবসর যদি পাই তবে এ-বিষয়ে বিশদ-ভাবেই বলিব, কারণ এ দিক দিয়াই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সমুদ্র-মন্থন মনে ঘটিয়া গিয়াছে। আজ সেকথা থাক্। সে দিনের প্রাকৃতিক আবেষ্টনির জন্যই মাদারীপুর ত্যাগ করিবার ছবিটি আমার মনে রহিয়াছে।

রাত্র সাড়ে ন'টার মত হইবে, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বিছানায় শুইয়া ছিলাম। এমন সময় সিপাহী আসিয়া ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি?"

—"আপনাকে দারোগাবাবু সেলাম দিয়েছেন।"

"কোন দারোগাবাবু?"

—"থানার বড় দারোগাবাবু।"

থানার বড় দারোগাবাবু এই রাত্রিবেলা সেলাম দিতে আসিলেন কেন, জানিবার কৌতূহল হইল, কিন্তু উত্তর করিলাম—"বলগে যে, রাত্রে এখন উঠতে পারব না; ভোরে আসেন যেন।"

অনুরোধ বহন করিয়া সিপাহী চলিয়া গেল। হাত বাড়াইয়া লণ্ঠনটা কমাইয়া দিতেছিলাম, চোখের উপর আলো তীক্ষ্ণ লাগিতেছিল, এমন সময় সিপাহী বার্তা-বহ হইয়া পুনরায় আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। আলোটা আর কমানো হইল না।

কহিলাম—"কি আবার এলে যে?"

—"দারোগাবাবু পাঠিয়ে দিলেন, খুব জরুরী দরকার, একবার গেটে যেতে হবে।"

—"খুব জরুরী দরকার?"

—"তাইতো বললেন।"

"চল, যাই।" বলিয়া বালিশের তলা হইতে গেঞ্জিটা নিয়া গায়ে দিলাম। সিপাহী তালা খুলিয়া বাহির হইবার সুযোগ দিল।

বাহিরে আসিতেই নজরে পড়িল যে, আকাশ ও পৃথিবী জ্যোছনায় ছাইয়া গিয়াছে। বন্ধ ঘরের মধ্যে থাকিতে রাত্রির এ-আয়োজনের খবর মোটেই পাই নাই। লণ্ঠনের আলো বন্ধ ঘরের অন্ধকারকে কোন মতে মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে করিতে পারিয়াছিল। আর এ-দিকে যে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জ্যোছনার দখলে আসিয়া গিয়াছে—অন্ধকারের জীবের মত নিজের গহ্বরে থাকিয়া তার খোঁজ রাখি নাই। অবশ্য রাখার উপায়ও ছিল না।

দিনের আকাশই যে রাত্রে এমন হইয়াছে, এ আমার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। এ-আকাশের জাতই আলাদা, রূপ তো আলাদা বটেই। দিনে মাথার উপর যে-আকাশ ছিল, এখন সে-আকাশ নাই, অন্য আকাশ-আচ্ছাদন আমাদের উপর আসিয়াছে। পক্ষী-মাতা যেমন নিবিড় স্নেহে ছানাকে পাখার আড়ালে ঢাকিয়া লয়, আমাদের এই ভূমণ্ডলকেও কোন বিরাট-বিহঙ্গী আকাশ-পাখায় আড়াল করিয়াছে —তাই গভীর প্রশান্তিতে সমস্তই স্তব্ধ ও নিশ্চিন্ত হইয়া আছে।

গেটে আসিলাম। লোহার বড় দরজার ও-পাশে বড় দারোগাবাবু দাঁড়াইয়া।

কহিলাম—"রাত্রে যে?"

—"দরকার পড়লে রাত্র আর দিন..."

—"দরকার কি শুনতে পারি?"

—"Transfer-order আছে। এই মেলে আপনাকে ফরিদপুর যেতে হবে।"

শুনিয়া মন নাচিয়া উঠিল, ফরিদপুর জেলে বন্ধুরা সব জমায়েৎ হইয়াছে, কাজেই—কিন্তু মনের নাচন থামাইয়া রাখিলাম।

—"ফরিদপুরে যেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার তো

একটা সুবিধা অসুবিধা আছে। রাত সাড়ে ন'টায় এসে বলবেন, চলুন এখনই যেতে হবে—এ কেমন করে হয়?"

—"কি করব বলুন, আমিও অর্ডার পেয়েছি আটটার পরে। আপনি তো এস-ডি-ওকে বলেছিলেন—"

—"তা বলেছিলাম। কিন্তু বেকার সাহেব তো বলেন নাই যে, আজই আমার যেতে হবে। বরং আমি পীড়াপীড়ি করায় শেষটা রাজী হলেন যে, দু'এক দিনের মধ্যে যাতে আমাকে পাঠাতে পারেন চেষ্টা করবেন।"

দারোগাবাবু বলিলেন—"আপনার তো মালপত্তর বিশেষ কিছু নাই, ঝাড়া হাত-পা, যেতে হাঙ্গামা কি?"

"তা আপনি বুঝবেন না আমি আজ যেতে পারব না।"

দারোগা সত্যই ভদ্রমানুষ, ব্যবহারে তো তাহাই মনে হইল। এমন ভাবে অনুনয় করিয়া ধরিলেন যে, শেষটা রাজী হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আজ যাইতেছি, বাসার ও এখানকার সকলকে তা জানানো দরকার যে।

কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেই দারোগা হাসিয়া ফেলিলেন—"ভাববেন না, যাঁরা খবর পাবার তাঁরা পেয়েছেন। স্টেশনে গিয়েই দেখতে পাবেন।"

আমার কিন্তু বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। পুলিশের লোক সত্য কথা বলে, নিতান্ত দায়ে না পড়িলে—এ-অভিজ্ঞতা আমার নাই। সত্যবাদী বলিয়া পুলিশের বদনাম আছে, পুলিশের লোকেও স্বীকার পাইবে না।

মিনিট পোনেরর মধ্যেই জেল হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে দারোগা ছাড়া সিপাহী কেহ নাই দেখিয়া একটু ভাবিলাম যে, ব্যাপারটা কি। যাহাকে খুঁজিবার জন্য ইউরোপীয়ান অফিসার পর্যন্ত সাত আটবার বাসায় সদল-বলে হানা দিয়াছে, ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভয়ঙ্করত্ব ও মর্যাদা এমন অনায়াসে এত কমিয়া গেল কেন।

কিন্তু স্টেশনের রাস্তায় না গিয়া দারোগাবাবু যখন "ওদিকে

নয়, এ রাস্তায় আসুন” বলিয়া সোজা নদীর ঘাটের দিকে মোড় ঘুরিলেন, আমি মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া পড়িলাম। কহিলাম—“স্টেশনে যাবেন তো?”

—“হাঁ, স্টেশনেই তো যাচ্ছি।”

—“তবে নদীর ঘাটের দিকে কেন? সোজা রাস্তা দিয়েই চলুন।”

—“রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে নিষেধ আছে।”

—“কেন?”

—“পুলিশ-পাহারায় সদর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, তায় এখানকার লোক, একটা demonstration হতে পারে, আই-বি তা চায় না।”

হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম—“ভুল করেছেন, এত রাত্রে demonstration করার মত লোক রাস্তায় পাবেন না, খামাকা ভাবছেন। চলুন হেঁটেই যাই।”

—“খামাকা পরিশ্রম করবেন কেন? বড় পানসী-নৌকা আছে, এ-জ্যোছনায় যেতে আরামও পাবেন, ভালোও লাগবে। আর আপনি তো শুনেছি কবি মানুষ।”

রাজী হইয়া গেলাম। কবি-মানুষ বলিয়া চিনিয়াছেন, অতএব কবির মর্যাদা রাখিতে হইবে, সে জন্যও নয়। কিম্বা প্রচ্ছন্ন প্রশংসায় তুষ্ট হইয়াছি তাহাও নয়। এই রাত্রে নদীতে নৌকায় চড়িয়া যাইতে পারিব—মন লোভী হইয়া উঠিল। লোভকে পাপ বলা হয়, আর পাপে মৃত্যু তো অবধারিত। আমারও মৃত্যু হইল—মানে বড় দারোগাবাবুর কাছে হার মানিলাম, আমার ইচ্ছামত রাস্তায় যাওয়ার কথাটা টিকাইয়া রাখিতে পারিলাম না।

নদীর ঘাটে আসিয়া দেখি, পুলিশের বড় নৌকা, বন্দুক হাতে কয়েকজন সিপাহী দাঁড়াইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে। সিঁড়ি ফেলানোই ছিল, উঠিয়া ছাদে গিয়া বসিলাম। দারোগা সাহেবও পাশে আসিয়া বসিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিয়া মাঝিরা দাঁড় লইল।

সবেমাত্র চৈত্র মাস শেষ হইয়াছে। বাতাসে গ্রীষ্মের তাপ যা ছিল নদীর স্পর্শে তা মুছিয়া গিয়াছে। আড়িয়ালখাঁর এ-পার ও-পার

জ্যোছনায় ভরিয়া গিয়াছে। কি সুন্দরই যে লাগিতে লাগিল! ভুলিয়া গেলাম যে, আমি বন্দী, আমাকে ঘিরিয়া সশস্ত্র পুলিশ-পাহারা। আমাকে বন্দী করে কে? আমার মুক্তি যে আকাশ-পৃথিবী যুড়িয়া আছে। ঐ আকাশ, ঐ সাদা পাতলা মেঘগুলি, এই নদী, তার ঐ তীরের ঘুমন্ত গ্রাম ও বন, দাঁড়ের আঘাতে ভাঙিয়া-পড়া হাজার-টুকরা-চাঁদ-নাচান ছোট ছোট ঢেউগুলি—এরা সমস্তে মিলিয়া সহস্র হাত দিয়া যে আমাকে আমার নিকট হইতে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে, অসীমের মধ্যে আমাকে ছাড়িয়া দিয়া কৌতুক দেখিতেছে—এ-খবর এত কাছে বসিয়াও তো পুলিশের কর্মচারী জানিতে পারিল না। সে নিশ্চিন্ত হইয়াই আছে, মানুষটার শরীর যখন নিজের জিম্মাতেই আছে, তখন আর বন্দী সম্বন্ধে ভাবনা কি। কিন্তু আমি যে বন্দী নয়, আমি যে মুক্ত পলাতক—এ-সত্য জানার মত শিক্ষা বা দৃষ্টি কোনটাই তার নাই।

শিক্ষিত উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীর পর্যন্ত ধারণা যে, মানুষের মন নিয়া মাথা ঘামাইবার দরকার করে না। জেলে আটকাইয়া রাখিয়া ভাবে, বন্দী করিয়া বেশ নির্যাতন করিতেছে। কিন্তু কতবড় মিথ্যা তাদের এ-বিশ্বাস—আমাকে দেখিলেই বুঝিতে পারিত। যতদিন আকাশ আমার চোখ হইতে না সরিবে, যতদিন দিনের-আলো আমার দৃষ্টি হইতে সরানো না হইবে, কিম্বা যতদিন ঊর্ধ্ব হইতে বৃষ্টির ধারা-পতন দেখা বন্ধ না করিতে পারিবে, অথবা দিন শেষ হইলে রাত্রে অন্ধকার নামিয়া-আসা না আটকাইতে পারিবে—ততদিন আমাকে বন্দী করার আশা দুরাশা, সে-আশা সরকারই করুক বা আমার সংসারই করুক।

দারোগা সাহেব আলাপ-আলোচনা চালাইতে কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যে আলাপ করিবে, সে আমার মধ্যে বহুক্ষণ অনুপস্থিত। এই আমার আড়িয়ালখাঁ, ঐ আমার মাথার উপর আমার জন্মভূমির আকাশ, আর আকাশে চাঁদ, তার দিগন্ত বিস্তারিত জ্যোছনা —আমি সকলের সঙ্গে একাকার হইয়া মিশিয়া গিয়াছিলাম।

স্টেশনে আসিয়া যখন নৌকা থামিল, তখন মনকে জোর করিয়া ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম, কহিলাম—"নামবেন না? চলুন, নীচে নামি।"

"নীচে নামবেন? কিন্তু পাড়ে যাবেন কি করে?—এই মাঝি, নৌকা পাড়ে নিতে পারবে?"

মাঝি উত্তর করিল—"হুজুর, স্টীমারে তো এখান থেকে উঠতেই সুবিধা হবে। এত নৌকা ঠেলে পাড়ে নেওয়া, আবার বের করা—বিস্তর হাঙ্গামা।"

দারোগাবাবুকে কহিলাম—"নৌকার ছইয়ের উপর দিয়েই চলুন যাওয়া যাবে।"

দারোগা সাহেব ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এতদূর হইতে ছইয়ে-ছইয়ে কিনারা পর্যন্ত বিস্তারিত বটে—কিন্তু তাতে পতনের সম্ভাবনাও তো আছে। তা ছাড়া বয়স্ক মানুষ, সাবধান-সতর্ক হইয়া চলাফেরা করাই উচিত।

দেখিলাম, তীর হইতে কয়েকজন লোক ছইয়ের উপর দিয়া হাঁটিয়া এ-দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সে-দিকে দারোগা সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিলাম—"ঐ দেখুন, ওরাও আসছে। চলুন নামি, আবার স্টীমার এসে পড়বে।"

কিন্তু নামিবার দরকার হইল না, যাহারা নৌকার ছইয়ের উপর দিয়া আসিতেছিল, তাহারা একটু অগ্রসর হইতেই পরিষ্কার জোছনায় তাদের মুখ চিনিতে পারিলাম। ডাকিয়া বলিলাম—"এই, এদিকে।"

ভাইদের মধ্যে দু'জন ও কয়েকটি বন্ধু আমাদের নৌকার ছাদে লাফাইয়া আসিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোরা খবর পেলি কি করে?"

হাসিয়া একজন সোজাভাবেই জবাব দিল—"যারা খবর দেবার তারাই দিয়াছে।" বলিয়া দারোগা-সাহেবের দিকে আড় চোখে চাহিয়া দেখিল।

দারোগা-সাহেব সত্য কথাই তবে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "যাঁরা খবর পাবার তাঁরা পাবেনই, ভাববেন না।" আর এরা বলিল "যারা খবর দেবার তারাই দিয়েছে।" ব্যাপার মন্দ নয়। সে-দিন এরকম হইতে পারিত, কিন্তু আজ এ একেবারে অসম্ভব। লোকজনকে কাছে আসিতে দেওয়া তো দূরের কথা, আমাদের যাতায়াতের পথে প্লাট-ফর্মে ভিন্ন দরজা খোলা হয়, বড় স্টেশনে গাড়ী আসিবার আগে কিছু দূরে আমাদের গাড়ী কাটিয়া রাখা হয়। আমাদের মুখ-দর্শন যাতে না করিতে পারে, তাই আমাদিগকে দলে দলে বাংলার বাহিরে রাজ-পুতনার বালির দেশে নিয়া রাখা হইয়াছে।

এদিকে চরমুগরিয়া হইতে বাঁশী বাজাইয়া স্টীমার রওয়ানা দিয়াছে, আসিয়া পড়িল বলিয়া। বক্তব্য যাহা তাহা সারিয়া নিলাম। দারোগা-সাহেব পাশেই মহা-মৌনীর মত চুপ করিয়াই বসিয়া কাটাইলেন, তিনি যে কিছু শোনেন বা দেখেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া আবিষ্কার করা গেল না।

স্টীমার আসিলে আমরা উঠিয়া বসিলাম, এরা সব নীচে নামিয়া গেল।

ইন্টার-ক্লাশের যাত্রী, ভিড়ের কোন ভয় ছিল না, তা ছাড়া সঙ্গে পুলিশ আছে--নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিলাম। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহন করেন জানিতাম, কিন্তু সরকারও যে বোঝা-বহনে ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী তা এবার জানিলাম।

প্রথম শ্রেণীর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিলাম। উপরে উঠিয়াই থামিয়া গেলাম। রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া এক ভদ্রলোক নদীর শোভা ও রাত্রির রূপ দেখিতেছিলেন। ভাবে মনে হইল, তিনি তন্ময় হইয়া আছেন। লোকটিকে চিনিলাম। একবার ভাবিলাম, কাছে গিয়া কথা বলি, আবার কি ভাবিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

লোকটি বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, আমরা চলিয়া গিয়াছি, তাই ঘাড় ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে চোখাচোখী হইতেই মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া নিলেন। ভদ্রলোকের লজ্জা আছে দেখিতেছি।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দারোগা-সাহেবের দৃষ্টিও ভদ্রলোকের উপর গিয়া পড়িল।

ডাকিয়া কহিলেন—"মনোমোহনবাবু যে—"

মনোমোহনবাবু কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমাকে চিনিতেন, হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন।

ইচ্ছা ছিল না, তবু ভদ্রতার খাতিরেই নমস্কারটা ফিরাইয়া দিতে হইল।

মনোমোহনবাবু থানারই একজন দারোগা, জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফরিদপুর যাচ্ছেন বুঝি?"

মাথা নাড়িয়া সায় দিলাম।

—"শরীর কেমন আছে? তেমন ভালো মনে হচ্ছে না, রোগা হয়ে গেছেন।"

—"হুঁ।"

ভদ্রলোক অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন, যাইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিলেন, কিন্তু ছল খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

—"আসি তবে, নমস্কার।"

—"দাঁড়ান, কথা আছে।"

যেন একটা আশ্চর্য কিছু শুনিলেন এমনভাবে চোখ মেলিয়া চাহিলেন। কহিলেন—"আমার সঙ্গে?"

—"হাঁ, আপনার সঙ্গে। আপনি আমাদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিলেন?"

—"হাঁ, ইনস্পেক্টর-বাবুর সঙ্গে খানাতল্লাসী করতে গিয়েছিলাম। আর তখন তো আপনি সেখানে ছিলেন।"

"তা ছাড়া আর যান নি?"

মনোমোহনবাবু চুপ করিয়া রহিলেন, উত্তর করিলেন না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন গিয়েছিলেন, জানতে পারি কি?"

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া আবার প্রশ্ন করিলাম—"মাকে গিয়ে কি বলেছিলেন? কি বলে আপনি আমার বাক্স খুলে চিঠি-কাগজ-

পত্র দেখতে চেয়েছিলেন? কি, উত্তর দিচ্ছেন না যে? আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। আপনার সংগে search-warrant ছিল যে, একবার সার্চ হয়ে যাবার দু'দিন পরেই একা গিয়ে খানাতল্লাসী করলেন?"

মনোমোহনবাবু এবার জবাব দিলেন—"আপনার কোন চিঠি বা কাগজ-পত্র আমি আনিনি, বিশ্বেস করবেন।"

"—তা আমি জানি, মা আমাকে বলেছেন। কিন্তু এইভাবে যাওয়া, কাগজপত্র তল্লাসী করা, আপনার কি স্বার্থ ছিল? আর আপনি গেলেনই বা কিসের জোরে?"

মনোমোহনবাবু আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না, যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

কহিলাম—"দাঁড়ান, আপনাকে আর বেশীক্ষণ detain করাবো না। দেখুন, বীরত্ব করা আমার স্বভাব নয়। মেজাজ গরম করতে আমার ঘৃণা হয়। এ মনে রাখলে আমার কথাটার অর্থ বুঝতে পারবেন। আমি আপনাকে বলতে চাই—মনোমোহনবাবু, আপনি অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, আর এগুবেন না! আচ্ছা, you may go now."

মনোমোহনবাবু নামিয়া গেলেন। তাঁর যাওয়াটা লক্ষ্য করিতেছিলাম। দারোগাবাবু এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই, জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হোয়েছে? ভদ্রলোকের 'পর আপনি এত চটেছেন কেন?"

আমার চোখে-মুখে তখন পর্যন্ত সহজতা ফিরিয়া আসে নাই। চলিতে চলিতে বলিলাম—"চলুন, ক্যাবিনে গিয়ে বসি, তারপর বলব।"

ক্যাবিনে আসিয়া দেখি সিপাহীরা ইতিমধ্যে বিছানা পাতিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। জামাটা খুলিয়া গেঞ্জি গায়ে বিছানায় গিয়া বসিলাম। স্টীমার তখনও ছাড়ে নাই।—

কিছুক্ষণ আগে মনোমোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলিয়া মনে যে বিষাক্ত কালো ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা আর ছিল না। যেটুকু বা ছিল, বাহিরের দিকে তাকাইয়া তাহাও মুছিয়া গেল। এমন কি একটা উদার

আনন্দের ভাব মনে ধীরে ধীরে জাগিতেছিল। বাহিরে নদী জ্যোছনায় শান্ত হইয়া আছে—দূরের ঐ পাড় জ্যোছনায় অস্পষ্ট হইয়া স্বপ্নে-দেখা ছবির মত লাগিতেছিল। আকাশের যে-দিকটা দৃষ্টির সম্মুখে ছিল, সেখানে চাঁদ দেখা যাইতেছিল না—কিন্তু সমস্ত আকাশ মার্জিত, স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ একটি রূপ নিয়া নিশীথ-রাত্রি জাগিতেছিল।

দারোগা-সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"মনোমোহনবাবুর সঙ্গে কি হয়েছিল? এত চটলেন কেন?"

ইচ্ছা হইতেছিল না যে, এ নিয়া আলোচনা করি। কথা দিয়াছি, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিতে হইল।

কহিলাম—"দেখুন, ইংরেজ-সরকার বা ইংরেজ-জাতিকে আপনারা ভালোবাসুন, আপন মনে করুন, তাতে বলবার কিছু আমার নাই। তার নুন খান, ঋণ শোধ করতে হবে—এও বুঝতে পারি। কিন্তু বিদেশী-সরকার ও বিজাতি-প্রীতি এও সম্ভব হয়—অথচ, আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এই নিজের দেশ ও লোককে ভালোবাসা, আপন মনে করা। এ-মনোভাব নিয়েও ঝগড়া করার প্রবৃত্তি আমার নাই। কিন্তু যখন এই মনোভাব উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে, স্বদেশবাসীকে পীড়ন ও তাদের ক্ষতি করতে যখন কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ আপনাদের মনে আসে না—তখন আপনাদের এই ইতর পৌরুষ আমার অসহ্য বোধ হয়। পুলিশ কর্মচারী দেশী লোক হয়েও যে মাঝে মাঝে খুন হয়—তার এই কারণ। যারা খুন করে, জানবেন, তাদের সহ্যশক্তি ও ধৈর্যের সীমা এই জাতীয় ব্যবহারে আপনারা শেষ করে আনেন।

"এই মনোমোহনবাবু আমাদের ভাড়াটিয়া, একটি বাসা নিয়া থাকেন। ইংরেজ-প্রীতি বা সরকার-প্রীতি যাই বলুন, তা কত উগ্র তাঁর, তা আমরা বহুদিন যাবতই টের পেয়ে আসছি। বাসার ছেলেমেয়েদের ইচ্ছা ছিল যে, নোটিশ দিয়ে তুলে দেওয়া। কিন্তু কর্তারা ভাবলেন, দারোগা-মানুষ, সরকারী চাকুরে, ভাড়াটা রীতিমত পাওয়া যাচ্ছে—কাজেই ভদ্রলোক এতদিন রয়ে গেছেন। সরকারের নুনের ঋণ-শোধ করিতে তিনি কেন যে এত ভয়ানকভাবে ব্যস্ত ও চিন্তিত হয়ে থাকেন,

তা সত্যি আশ্চর্যের বিষয়। দেশের বাড়ী আমাদের ইতিমধ্যে তিন-চারবার সার্চ হয়ে গেছে, তাতেও তাঁর তৃপ্তি হয়নি। একদিন একা গিয়ে হাজির। মা তাঁকে চিনতেন। শুনলেন যে, তাঁর ছেলের বাক্স-পেটরা আর একবার দেখতে তিনি এসেছেন। মেয়েমানুষ, তায় বাড়ীতে সেদিন পুরুষছেলে কেউ ছিল না, রাজী হয়ে গেলেন। সার্চ-ওয়ারেন্ট দরকার, সাক্ষী দরকার, এসব কথা মার মনেও এল না। ভদ্রলোক ঘণ্টাকয়েক নির্বিঘ্নে কষ্ট স্বীকার করে কাগজপত্র ঘেঁটে এলেন। আচ্ছা, বলতে পারেন সরকারের আদেশ-পালন নয়, তবু এ কেন তিনি করতে গেলেন? কি প্রয়োজন ছিল তাঁর?

"শুনতে পাই ইন্‌স্পেক্টর হবার লোভ তাঁর, তা তাঁর হওয়া চাই। বলতে লজ্জা করে, তবু বল্‌ছি, তাঁর স্ত্রীও স্বামীর এ-রোগে আক্রান্ত। স্বামীর কাজে সাহায্য করা তাঁর ধর্ম হয়ে উঠেছে। আমাদের বাসায় যখনই তিনি আসেন, সবাই ভাবিত হয়ে উঠেন। ধরাপড়ার কয়েকদিন আগের ব্যাপার—আপনাদের Superintendent-সাহেব বার পাঁচেক বাসা খুঁজে গেছেন আমাকে পাবার জন্যে। না পেয়ে তিনি যে ভয়ানক চটেছিলেন, তা তিনি নিজে গোপন করার দরকার বোধ করেন নি। তল্লাসীর যে-নমুনা দেখিয়েছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি। কিন্তু বেশী চটেছিলেন মনোমোহনবাবু দারোগার স্ত্রী এই ভেবে যে—লোকটাকে প্রায়ই তো বাসায় দেখতে পাই, অথচ গ্রেপ্তার করার সময়ই তাকে বাসায় পাওয়া যায় না। সাহেব যদি শেষে তাদের আর বিশ্বাস না করেন, স্বামীর প্রমোশন হয়তো রেগে চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু ভদ্রমহিলা মাথা ঠাণ্ডা রেখে ওৎ পেতে রইলেন। সাহেবের কাছে মিথ্যাবাদী নাম তিনি দূর করবেনই।

"সে দিন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বেলা দেড়টায় বাসায় এসেছি। মাইল কুড়ি-পঁচিশের মত হাঁটতে হয়েছিল, তা ছাড়া গত রাত্রে ঘুমাবার সুযোগ পাইনি। স্নানটা সেরে কোনমতে কয়েক গ্রাস গিলে নিতে পারলেই ঘুম দিতে পারি। পুকুরের ঘাটে গেলাম। সিঁড়ির

উপরে কাপড় গেঞ্জি ও স্যাণ্ডাল নিয়ে এক বোন বসে ছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, সোনাদা' এদিকে ঘুরে দাঁড়াও।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, অন্য এক ঘাটে একটি মেয়েলোক কাজ করবার জন্য আসছেন।

গলাজলে দাঁড়িয়ে গাত্র-মার্জনায় ব্যাপৃত ছিলাম। বোনের আদেশমত ও-ঘাটের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালাম। শুনলাম—কুন্দ, এ কে?

বোন উত্তর করল—আমার দাদা।

—কে, তোমার সোনাদা'?

—না, আমার মণিদা'।

আমাকে বল্ল—তুমি তাড়াতাড়ি কর। আজ বোধ হয় তোমার কপালে ভাত নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম—কে রে?

—দারোগার বৌ।

—ও, তাই।

ইচ্ছা হোল বৌটিকে ভালো করে দেখে নেই। বোনের নিষেধ সত্ত্বেও ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, বয়স বেশী নয়, ছাব্বিশ-সাতাশের রোগা ও ফর্সা একটি স্ত্রীলোক। ঘাটে তাঁর কি কাজ ছিল তা তিনিই জানেন। উঠে গেলেন। সোনাদা' কিম্বা মণিদা'—এ-সন্দেহ যেটুকু ছিল, তা মিটে গেছে। ঘরের জানালা হতে আমাকে দেখতে পান—নিঃসন্দেহ হবার জন্য ঘাটে আসেন এবং তা হয়ে ফিরে যান।

খাওয়া-দাওয়া সেরে কোন ঘরে নিদ্রা যাব ভাবছিলাম। বোন বল্ল—বাসায় থাকতে পারবেনা অন্য জায়গায় গিয়ে ঘুমোও!

—এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না। দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছি না।

—না, তা হবে না। পুলিশ এল বলে—তুমি যাও। সোনাদা' না মণিদা' এ-প্রশ্নের পরেও তুমি থাকতে চাও? কথা শোন।

কথা শুনলাম না। আমার অবস্থা দেখে শেষে রাজী হল। পাশের বাসার ভাড়াটে ভদ্রলোক একাই আছেন, ছেলেমেয়েরা সব দেশে, একটা খালি ঘরে বিছানা পেতে বার থেকে শিকল টেনে বোনতো চলে গেল।

এক সময়ে ধাক্কা খেয়ে জেগে দেখি, ভাই-বোনেরা কয়েকজন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ-মুখে উত্তেজনার চিহ্ন।

—কি, ব্যাপার কি?

—এই এতক্ষণে পুলিশ বিদায় নিল। তোমাকে ঘরে বন্ধ করে ফিরে গিয়ে কেবল একখানা বই হাতে নিয়েছি, দেখি জ্যাঠামহাশয়, বল্লেন—পুলিশ এসেছে, সার্চ করবে। পিছনে দেখি সুপারিন্টেনডেন্ট নিজে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে দারোগা-পুলিশ।

হেসে বল্লাম—কুন্দ, দারোগার বৌকে সান্ত্বনা দিয়ে আসিস। হয়তো আশা-ভঙ্গ হওয়ায় উনিও সাহেবের ভয়ে বিছানা নিয়েছেন।

—তা ভালো করেই দিয়ে আসব।

এক ভাই থার্ড-ক্লাশে পড়ে, রাগটা তার অমনিই একটু বেশী, বল্ল —ওর স্পাইগিরি ছুটিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও।

ধমক দিয়ে বল্লাম—রাখ বীরত্ব করতে হবেনা। যদি শুনি যে, কোন কথা বলেছিস্ বা কোন খারাপ ব্যবহার করেছিস্, তবে জানবি সেদিন থেকে তোদের মুখ দেখা আমি বন্ধ করব।

বোন বল্ল—তুমি ইচ্ছে হয় মুখ দেখা বন্ধ করতে পার। কিন্তু আমি কয়েকটি কথা না বলে পারবনা বলে রাখলাম।

ওদের শান্ত করতে আমার বেশী বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু যে-ঘৃণা আমার মনে জন্মেছে তা থেকে আমি আজও রেহাই পাইনি। তাতো কিছুক্ষণ আগেই দেখলেন।"

একটু থামিয়া কহিলাম—"সত্যি, আমার কাছে আশ্চর্য লাগে, এ কেমন করে হয়। মেয়ে-মানুষ, স্নেহ-ভালবাসা যেখানে স্বভাবতই বেশী থাকে, সেখানেও এ-রকম হয়—বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, দুঃখও হয়।"

দারোগা-সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন। জামাটা তুলিয়া পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া দেখি, তা খালি, সিগারেট নাই।

দারোগা-সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন—"নিয়ে আসছি। 'গোল্ড-ফ্লেক' তো?"

—"আপনি কেন যাচ্ছেন? ওদের দিন, এনে দেবে।"

—"তাতে কি। যাই, নিয়ে আসি। পান খান তো?"

পান-খাওয়ার অভ্যাস নাই শুনিয়া অবাক হইলেন। সিগারেট চলে অথচ পান খাইনা, হিসাব-মিলানো বোধ হয় দারোগা-সাহেবের কষ্টকর ঠেকিতেছিল।

স্টীমার বাঁশী বাজাইয়া স্টেশন ছাড়িল, কিছুক্ষণ পরে দারোগা-সাহেব ফিরিয়া আসিলেন।

সিগারেট ও দেশলাই হাতে লইয়া বলিলাম—"ম্যাচ আমার সঙ্গেই ছিল, আবার আনলেন কেন? রেখে দিন।"

দারোগা-পত্নীর কাহিনী বলিতে গিয়া মনে আবার কালো ছায়া নামিয়াছিল। সিগারেট মুখে লইয়া কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম। খদ্দরের চাদরটায় কোমর পর্যন্ত ঢাকিয়া লইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম। ক্ষণপূর্বে মনে যে উদার আনন্দ ধরা দিয়াছিল, তার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিলাম। আমি যেন একা বাসর জাগিতেছি, মনের পাশে আসিয়া যে বসিবে তাকে শান্ত আকাশ ও নদীর কোথাও দেখিতে পাই কিনা, চোখ মেলিয়া রহিলাম। এক সময়ে ঘুম আসিল কিন্তু সে-শান্তি আসিল না। —ঘুমাইয়া পড়িলাম।

এক সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ মেলিতেই ইলেকট্রীকের কড়া আলো চোখের উপর আসিয়া পড়িল—যেন কার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। চোখ কয়েকবার বুজিয়া-মেলিয়া আলোটা সহাইয়া লইলাম। দেখিলাম সবুজ রংয়ের ছোট ছোট অসংখ্য পোকা আলোটাকে ঘিরিয়া ঘুরিতেছে। উজ্জ্বল আলো অন্ধকার হইতে অসংখ্য পতঙ্গকে টানিয়া আনিয়াছে। কাচের আবরণ না থাকিলে আলোক-পিপাসী এই সংখ্যা-হীন পতঙ্গের দল বহুপূর্বেই জ্বলিয়া ছাই হইয়া যাইত।

পায়ের কাছে দারোগা-সাহেব মুড়িশুড়ি দিয়া অঘোরে নিদ্রা যাইতেছেন। নীচে মেঝেতে সিপাহী কয়জনও ঘুমে অচৈতন্য—পাশেই বন্দুক কয়টা তাদেরই মত নির্জীব হইয়া পড়িয়া আছে। তাদের

শিওরের কাছে এক ভদ্রলোক-যাত্রী বেঞ্চে স্থানাভাব দেখিয়া নীচে শতরঞ্চি বিছাইয়া জায়গা করিয়া লইয়াছিলেন, তিনিও নিদ্রিত। নদীর বাতাস ঠাণ্ডা লাগিতেছিল। উঠিয়া চাদরটা গায়ে দিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া বাহির হইলাম।

বাহির হইয়া দেখিলাম—ঘুমন্তপুরী। নীচে স্টীমারের হৃদ্‌-স্পন্দন ছাড়া কোথাও প্রাণের সাড়া-শব্দ নাই। পোটলা-পুটলী বাক্স-পেটরা ইত্যাদি নিয়া সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জাগিলে এই মানুষ-গুলিই বিভিন্ন চরিত্র নিয়া সংসারে চরিয়া বেড়ায়, এখন সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা গুটাইয়া লইয়া মড়ার মত পড়িয়া আছে। একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাৎ ও ব্যবধান বুঝিবার উপায় নাই। চরিত্র-হীন লম্পট আর সংযত সাধুচরিত্র ব্যক্তি, কে ইহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাহির করিতে পারে, সব সমান হইয়া গেছে।—

ঘুমন্ত মানুষ সত্যই অদ্ভুৎ লাগে। মনে যেন কেমনতর একটা ভাব হয়, এদের অপরিচিত বোধ হয়। একটু ভয়-ভয় ভাবও থাকে। এখন রাত্র প্রায় দেড়টার মত হইবে, প্রেসিডেন্সি-জেলের বন্দীরা সবাই ঘুমাইয়া আছে। পাশের সীটে যে ভদ্রলোক ছিলেন, জ্বর হওয়ায় আজ বিকালে তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কিছুক্ষণ আগে প্রস্রাবের ঘরে গিয়াছিলাম। করাইডর দিয়া স্যাণ্ডালে শব্দ না হয় এমনভাবে সন্তর্পণে গিয়াছি ও আসিয়াছি। সমস্ত জুড়িয়া ঘুমের এমন একটি আচ্ছাদন ছিল যে, আমার সামান্য নিঃশ্বাসেও যেন তা দুলিতে পারে। দুই ধারে সারি সারি ঘুম খাটে পড়িয়া আছে, আমিই একমাত্র জাগ্রত-চেতনা মধ্য দিয়া পথ করিয়া হাঁটিয়া গিয়াছি। করাইডরের আলোতে পর্দার ঘরের মধ্যে বন্ধুদের যে-ছবি দেখিয়াছি, তাতে এরাই যে দিনের বেলার লোকজন তা বিশ্বাস করিতে কষ্টকর হইতেছে।

ঘুমন্ত মানুষ আমার কাছে সত্যই রহস্যের মত লাগে। এমন সব প্রশ্ন মনে আসে যা দিনের আলোতে সচরাচর আসে না। বাহিরে লণ্ঠন হাতে পুকুর-পাড়ের রাস্তায় সিপাহী ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহারা

দিতেছে, তাকেও এখন অলৌকিক জগতের জীব বলিয়া মনে হয়। একে রাত্র গভীর এবং ভয়ানক অন্ধকার, তায় আবার চারিপাশে পুঞ্জীভূত নিদ্রা বিস্তৃত হইয়া আছে। মনকে কোন অদৃশ্য অন্ধকারের দিকে কে যেন টানিয়া নিতে চায়। কিন্তু রাত্রিবেলার এ অচেনা প্রশ্নকে অনুসরণ করিয়া অজানা অপার অন্ধকারে গিয়া প্রবেশ করিতে ভয় লাগিতেছে। মনকে ঝাঁকানি দিয়া আবার সাত বছর আগের রাত্রিতে নিয়া যাই—স্টীমারের হৃদ্-স্পন্দন, পাখায় জল-কাটার শব্দ মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করিয়া বর্তমানের এই বাস্তবতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লই।--

সিগারেটটা প্রায় অর্ধেক জ্বলিয়া মাথায় ছাই জমিয়া আছে—টোকা দিয়া ঝাড়িয়া ফেলি। পাশেই মেয়েদের ইণ্টার-কেবিন, নীচে যাইবার সময় চোখে পড়িল সেখানেও ঘুম। একটা শিশু মায়ের স্তনে মুখ রাখিয়া ঘুমাইতেছে--মায়ের হাতটা ছেলেটাকে ঘুমের মধ্যেও বেষ্টন করিয়া বুকের কাছে ধরিয়া রাখিয়াছিল। ছবিটি চোখের উপর লইয়া সিঁড়ির মাথায় আসিলাম।

নীচে নামিতে গিয়া দেখিলাম, ও-পাশে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। ঠাহর করিয়া দেখিলাম--বুড়ামানুষ, হাতে একটি থলি, বোধ হয় মালা জপিতেছে। এই একটি মাত্র মানুষকে জাগা দেখিলাম। সবাই যখন ঘুমাইতেছে, তখন এ জাগিয়া বসিয়া নাম জপিতেছে। ঈশ্বর আছেন কি নাই, এ-শ্রম সফল বা পণ্ড-শ্রম ইত্যাদি প্রশ্ন মনে উঠিল না। যে বিশ্বাস করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাকে মনে-মনেও বিচারের বস্তু করিয়া কৃপা দেখাইবার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না।

নীচে আসিয়া স্টীমারের কল-ঘরের সামনে রেলিং-এ ভর দিয়া দাঁড়াইলাম। একটা চাকার সামনে টুল পাতিয়া একজন খালাসী তামাক টানিতেছিল। দরকার মত উঠিয়া চাকা দুই হাতে ঘুরাইয়া গতি মন্থর বা দ্রুত করিতে হইবে, তাই জাগিয়া বসিয়া আছে। স্টীমারের প্রকাণ্ড পিস্টন কয়টা কেবল উঠিতেছে আর পড়িতেছে

প্রচণ্ড শক্তির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত। বয়লারের মুখের ঢাকনী খুলিতেই ভিতরের আগুনের আলোয় নীচের সবটা পরিষ্কার দেখা গেল। একজন খালাসী মাথায় কালো একটা রুমাল জড়াইয়া স্টীমারের বিরাট অগ্নিগর্ভ-উদরে কয়লা ঠেলিয়া দিল, বড়-একটা লোহ অস্ত্র দিয়া ভিতরটা বেশ খুঁচাইয়া দিয়া তারপর দরজা বন্ধ করিল।

এখন কে বুঝিবে আগুন ভিতরে জ্বলিতেছে—বাহির হইতে সামান্য তাপ ছাড়া আর কিছু বুঝিবার যো নাই। এই আগুন আর জলে মিলিয়া এই বিরাট কাণ্ড চালাইয়া যাইতেছে। মানুষের বুদ্ধি দুটি অন্ধ-শক্তিকে এমন সম্পর্কে ও এমন প্রণালীতে আবদ্ধ করিয়া লইয়াছে যে, এতবড় একটা স্টীমারকে তা অনায়াসে জল ভাঙ্গিয়া ঠেলিয়া নিয়া যাইতেছে। শক্তিকে যদি বুদ্ধিতে সংযত করা যায় তবেই এই রকম অত্যাশ্চর্য কাজ পাওয়া যায়—কথাটা মনে সত্যের মত ধাক্কা দিল।

অনেকক্ষণ হয় নীচে নামিয়াছিলাম। আবার উপরে উঠিয়া গেলাম। সিঁড়ির ওধারে লোকটি তেমনি বসিয়া আছে। মেয়েদের ক্যাবিনেও ঘুমে সবাই অচৈতন্য। এদিকের যাত্রীরাও কেহ জাগ্রত বলিয়া মনে হইল না।

ক্যাবিনে ঢুকিতেই দেখি এক সিপাহী উঠিয়া বসিয়া আছে। বুঝিলাম, জাগিয়া আমাকে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। তাদের নিদ্রিত দেখিয়া কোন স্টেশনে নামিয়া পলায়ন করিয়াছি কিনা এবং এজন্য দারোগা-বাবুকে জানানো উচিৎ কিনা বেচারার ইত্যাদি চিন্তার মাঝখানে মূর্তিমান মীমাংসার মতই আমি গিয়া উপস্থিত হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় গিয়েছিলেন?" সুরে নিষ্কৃতিবোধের আভাস।

—"নীচে।"

—"প্রস্রাব করতে বুঝি?"

—"হাঁ।"

—"আমিও একটু নীচে ঘুরে আসি"—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। আমি আবার বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

যখন জাগিলাম, তখন দেখি স্টীমার পদ্মা-নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। চারিদিক পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। দূরে নদীর পূব-পারে গ্রামের গাছের মাথায় আকাশে লাল-রংয়ের ছোপ লাগিয়াছে। অন্ধকার ঠেলিয়া যে প্রকাণ্ড বহ্নি-পিণ্ড আসিতেছে, আকাশ-মুখে ঐ তার পূর্বাভাস। শুকতারাকে দেখিবার জন্য চারিদিক তাকাইলাম, কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। পদ্মার উপর প্রশান্ত প্রভাত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুই চোখ মেলিয়া রাখিলাম—মনের আকাশে কি এমন করিয়া জ্যোতির্ময় কোন সত্য প্রকাশিত হইতে পারে না, যার আলোতে দৃষ্টি সর্বত্র মুক্তি পায় এবং যে-আলো কখনও নিষ্প্রভ বা অস্তমিত হয় না?

*   *   *   *

আমাকে ফরিদপুর-জেলের অফিসের জিম্মা করিয়া দিয়া দারোগা-সাহেব বিদায় নিয়াছেন প্রায় আধঘণ্টা হয়। যাইবার সময় নমস্কার করিয়া জানাইয়া গিয়াছেন যে, পথে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁর ব্যবহারে হইয়া থাকে তা যেন মনে না রাখি। আমিও নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া কথা দিয়াছি যে, তা মনে রাখিব না।

এদিকে রাত্র প্রায় সাড়ে দশটা, অফিসে আর কত বসিয়া থাকিব, ভিতরে যাইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিলাম।

জমাদার ও সিপাহী ছাড়া একটি মাত্র লোক অফিসে চেয়ারের উপর পা তুলিয়া উবু হইয়া বসিয়া খাতা লিখিতেছিলেন। পদ-মর্যাদা যে তাঁর খুব বেশী তা আমার মনে হয় নাই।

তবু কহিলাম—"আমার ভিতরে যাবার বন্দোবস্ত করে দিন, আর কতক্ষণ বসে থাকব?"

অর্ধদগ্ধ বিড়িটাকে আবার জ্বালাইয়া লইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?"

—"সে কথা কতবার জিজ্ঞেস করবেন? খাওয়া-দাওয়া আমার হয়ে

গেছে, সে-জন্য ভাববেন না। এখন ভিতরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন।"

—"বসুন না, যাবেনই তো। ততক্ষণ একটু গল্প করা যাক!"

গল্প করিবার মত ধৈর্য আমার ছিল না, তাহা জানাইয়া দিতে তিনি জমাদারকে কহিলেন—"বাবুকে ভিতরে নিয়ে যাও।"

জমাদার কি একটা প্রশ্ন তুলিল বুঝিলাম না। শুধু কানে আসিল সেলে নিয়া যাইবার কথা।

কহিলাম—"আর যাঁরা আছেন, তাঁরা কোথায় থাকেন, সেইখানেই আমাকে পাঠিয়ে দিন।"

—"সে আমি পারব না, জেলার বাবু আসুন।"

—"তিনি কখন আসবেন?"

—"ঠিক নেই। নাও আসতে পারেন।"

—"তিনি যদি না আসেন, তবে কি সারারাত এখানে বসে কাটাব?"

—"না, এগারোটা অবধি দেখব, তারপর আজ রাত্রের মত একটা সেলে পাঠিয়ে দেব। ভোরে জেলারবাবু, সুপার এদের সঙ্গে কোথায় থাকবেন ঠিক করে নেবেন।"

উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিলাম। এমন সময় রোগা পাতলা একটি ভদ্রলোক ঢুকিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, ব্যাপার কি?"

ভদ্রলোক একটু তোতলা। পরিচয় পাইলাম যে ইনিই ডেপুটি-জেলার। ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিতে তিনিও আমাকে বলিলেন—"আজ সেলেই চলুন, কাল ভোরে সব ঠিক করে দেওয়া যাবে।"

আমি আমার আপত্তি জানাইলাম। ভদ্রলোক কহিলেন—"যখন ছাড়বেন না, তখন চলুন। কি আর করা যায়।"

জেলের ভিতরে ঢুকিলাম, সঙ্গে ডেপুটি-জেলার ও এক জমাদার। অবশেষে একটা ওয়ার্ডে ঢুকিয়া ডেপুটি-বাবু বড় বারান্দা-আলা এক ঘরের দরজায় কড়া নাড়া দিলেন।

ডাকিয়া কহিলেন—"পঞ্চাননবাবু, ঘুমুলেন নাকি?"

—"না, কেন?"

—"আরে মশায় উঠুন। দেখুন, কি এনেছি।"

ভিতরে অনেকগুলি পায়ের শব্দ পাইলাম এবং দরজার সামনে যে অনেকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বুঝিলাম।

ভিতর হইতে উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—"কি এনেছেন?"

—"তা বলব না, খুলেই দেখুন।"

তালা খুলিয়া দিবার তর তাদের সহিতেছিল না। দরজা খুলিতেই ডেপুটি-জেলার বলিলেন—"নিন, আপনাদের জিনিস আপনারা নিন।"

অনেকগুলি হাত প্রসারিত হইয়া পড়িল। সে কী চীৎকার আর হল্লা—যেন মদ খাইয়া মাতলামী শুরু হইয়াছে।

উপেনবাবু (দাস) হুলুধ্বনি দিয়া বরণ করিয়া নিলেন। এবং মেয়েরা যেমন জামাই-বরণ করে, তেমনি হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া গান ধরিলেন—"এতদিন যে বসেছিলাম পথ চেয়ে আর কাল গুণে—"

যতীনদা' (ভট্টাচার্য) মুচকি-মুচকি হাসিতে লাগিলেন।

টেনাবাবু বলিলেন—"ডেপুটির গলা শুনেই বুঝতে পারলাম যে তুই।"

ফণী মজুমদার বলিল—"ভাইডী আইছস্, ভাল করছস্।"

অভ্যর্থনা ও সম্বর্ধনার বেগ একটু প্রশমিত হইলে আমাকে ঘিরিয়া লইয়া সবাই বসিলেন। ইহারা আটজন অষ্ট-বজ্র হইয়া এতদিন ছিলেন, এখন আমি আসিয়া পড়ায় আট হইল নয় এবং সব মিলিয়া হইল নব-রত্নের সভা।

বুড়া বয়সে মানুষ পিছনে ফিরিয়া তাকাইয়া যখন দেখে, তখন স্কুল-কলেজের ছাত্র-জীবনটাই জীবনে সব চাইতে সুখের ও শ্রেষ্ঠ মনে করে। হয়ত এমন অসম্ভব আশাও করে যে, আর একবার যদি সে-দিনগুলি ফিরিয়া পাওয়া যাইত তবে জীবন এবার এমন করিয়া শুরু করিত যে, ভুল-চুকগুলি ঘটিতে দিত না—যে-সব ভুলের জন্য

জীবন মনের মত হইতে পারে নাই। বন্দি-জীবনে এই দীর্ঘদিন অতিবাহিত করিয়া আসিয়া আজ আমার মনে হইতেছে যে, ফরিদপুর-জেলের দিনগুলিই আমার জেল-জীবনের সুখের ও শ্রেষ্ঠ দিন গিয়াছে।

একতলা একটি বিল্ডিং-এ আমরা নয়জন থাকিতাম। দক্ষিণ-মুখী ঘর, খোলা লম্বা টানা-বারান্দা। রেলিং-এর ও-ধারে জেলের পুকুর। তার পাড় ঘেঁষিয়া দক্ষিণে জেলের প্রাচীর। দেয়ালের ও-ধারেই সহরের রাজ-পথ, রাস্তার দক্ষিণে খেলার মাঠ—তারপর ফরিদপুর কলেজের বাড়ী। বারান্দায় বসিয়া কলেজের বাড়ীর চূড়া দেখা যাইত —তারপরেই দৃষ্টি আকাশের সীমায় শেষ হইত।

আমাদের বিল্ডিংটিকে বাংলো বাড়ীর মত মনে হইত। জেল-খানায় এটি যেন কোন সৌখীন ধনীর স্বাস্থ্যনিবাস—সামনে একটু বাগান ও পরে পুকুরটি থাকায় এটি ঐরূপই দেখাইত। বর্ষাকালে পুকুরের জল কানায় কানায় ভরিয়া যায়। একদিন রাত্রে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ নজরে পড়িল, যে আমাদের ঘরটির ছায়া পুকুরের জলে পড়িয়াছে, ছায়ার আলোগুলি জলে ঝিকি-মিকি করিতেছে। সেদিন হইতে ঘরটিকে ভালোবাসিয়া ফেলিলাম।

গ্রীষ্ম চলিয়া গেলে যখন বর্ষা আসিল, তখন সেই বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া চোখের ও মনের তৃপ্তি মিটাইতাম। কত সন্ধ্যা ও রাত্রের প্রথম অংশ এইভাবে বসিয়া বর্ষার উৎসব দেখিয়াছি—এতদূর হইতে এখন তা স্বপ্নের মত মনে হয়। এমন যে কুৎসিত ব্যাঙ তার কর্কশ গম্ভীর সুর পর্যন্ত কান পাতিয়া শুনিতাম—বর্ষার অন্তর্নিহিত সুরের গাম্ভীর্য তারা আরও সঘন করিয়া তুলিত। আকাশ হইতে অবিরল জলধারা নামিতেছে। চারিদিক দিনের বেলাতেই ছায়া-অন্ধকারে আবৃত, আকাশে যতদূর দৃষ্টি যায় মেঘে-মেঘে সঘন হইয়া আছে: মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলক দিয়া যাইতেছে—এ সমস্ত মিলিয়া বর্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারিত না যদি ব্যাঙের সেই একটানা গম্ভীর ধ্বনিটি না থাকিত। কেকা-ধ্বনিতে নয়, মেঘ

গর্জনে নয়, কুটজ-কুসুমেও নয়—ব্যাঙের ডাকেই বর্ষার নিজস্ব সুর ও রূপ অভিব্যক্ত হইতে পারে। অন্ধকারে জেলের নর্দমায়, পুকুরের পাড়ে ব্যাঙ ডাকিত, রিম্‌ঝিম্‌ অবিরল পানি বরিষণ—শুনিতে শুনিতে যে কতরাত্রি জাগিয়াছি, ভাবিলে হাসি পায় না, ছেলেমানুষী মনে হয় না, বরং মন তৃষার্ত হইয়া উঠে সে-বর্ষারাত্রিগুলির জন্য। মনে করিতে আজও জলে-ভেজা বিহগীর মত একটুখানি ছোট ভীরু-সুখ বুকের নীচে ডানা নাড়া দিয়া উঠে, শেষ জল ফোঁটা ঝাড়িয়া ফেলিতে চঞ্চল হয়।

বর্ষা-রাত্রের একদিনের ছোট একটু ঘটনা মনে আসিয়াছে।—

সে-দিন রাত্রে গুরু-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। আমের কাল গিয়াছে, কিন্তু দাম দিলে তখনও মিলিত। তদুপরি স্বর্ণবর্ণ বৃহৎ কদলীও সংগৃহীত ছিল। যে-সব বড় বড় ইলিশ-মৎস্য পদ্মার গভীর জলে বসবাস করে, তাহাদের কতিপয়কে ধীবরেরা জালে আটকাইয়া তুলিয়া ফেলিয়াছিল; জলতল-বাসী বৃহদায়তন বন্দীদের কয়েকটি এই জেল-খানার বন্দীদের রান্নাঘরে আনীত হইয়াছিল। আমরা নিরামিষ-ভোজী ছিলাম না, মাংসেও আমাদের রুচি ছিল, তাই খাদ্যতালিকায় তাহাও পড়িয়াছিল। দিনের বেলাতেই সূচনা দেখিয়া আশংকা করা গিয়াছিল যে, রাত্রে বর্ষণটা একটু মুষলধারেই হইবে। সর্বোপরি, জেলখানায় আবদ্ধ থাকায় কারু মনে কোন সুখ ছিল না। সেই জন্যই সব দিক ভাবিয়া গুরু-ভোজনেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

রাত্রের ভোজনের জন্য বিকাল হইতেই দেখিলাম সবাই প্রস্তুত হইতেছেন। যতীনদা পর্যন্ত জেল-গেট হইতে ঘানিঘর পর্যন্ত লাল-সুরকির রাস্তা দ্রুত-বেগে ভ্রমণ করিতেছেন, সঙ্গে মাস্টার মশায় অশ্বিনী দাস—গেঞ্জিটা ঘামে ভিজিয়া টুপটাপ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম করিবেন না, উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন।

একটু অধিক রাত্রে আমরা আসনে গিয়া বসিলাম। আমাদের কাজ-কর্ম করিবার জন্য যে কয়েকজন কয়েদী পাইয়াছিলাম, তার মধ্যে তিনজন আমাদের ঘরেই থাকিত, বাকী ক'জন ভোর হইলে 'নম্বর'

হইতে এখানে আসিত আর সন্ধ্যায় বন্ধ হইবার জন্য চলিয়া যাইত। জেলারের সঙ্গে কথা ছিল যে, তারা রাত দশটায় যাইবে। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তারা তৈরি হইয়াছিল—জমাদার আসিয়া তাদের লইয়া গিয়াছে। নেপাল, কাঙ্গালী ও সদানন্দ এই তিন জন পরিবেশনে লাগিল।

ভোজনের বর্ণনা করিব না, কারণ সে বর্ণনার বস্তু নয়—চোখে দেখিবার জিনিস। মানুষ যে এমন মরণ-পণ করিয়া খাইতে পারে, আগে বিশ্বাস করি নাই। এখন দেখিলাম, এ-বিষয়ে আমার জ্ঞান কত স্বল্প। সেদিন প্রত্যয় হইল যে, মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব।

শেষের দিকে সবাই যখন ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ফণী, আর কিছু লাগবে?"

—"লাগবে।"

যতীনদা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন, ফণীর আহারের পরিমাণ ও নমুনা দেখিয়া তিনি আশঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। চোখের উপর এইরকম আত্মঘাতী চেষ্টা দেখিয়া উদ্বেগ চাপিয়া রাখা সত্যই কষ্টকর। আশ্চর্য হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি লাগবে?"

সুরটা আমাদের কানে যে ভাবে ঠেকিল, তাতে প্রশ্নটার অর্থ হয় যে, থাক আর লাগিয়া দরকার নাই, যথেষ্টের চেয়ে বেশী অনেক আগেই হইয়াছে, আর না।

ফণী ঘাড় না তুলিয়াই জবাব দিল—"একটু সময় লাগবে।"

যতীনদা আশ্বস্ত হইয়া দম মুক্ত করিলেন, বুঝা গেল সময় দিতে তাঁর আপত্তি নাই। যা মাল বোঝাই হইয়াছে তার ঠেলা সামলাইতে পারিবে কি না, ফণী সম্বন্ধে এ-আশঙ্কা যতীনদা মনে মনে রাখিলেন না, প্রকাশ্যেই বলিয়া ফেলিলেন।

ফণী এক সময়ে মাথা তুলিয়া কহিল—"আমরা পশুর চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে আছি।"

টেনা কহিল—"না পিছনে নয়, সমান-সমান আছিস।"

সব কথা কানে তোলা ফণীর স্বভাব নয়। তা ছাড়া মন এখন তার দুঃখে-ভরা।

কহিল—"গরু-মোষ-ছাগল-ভেড়া সারাদিন মাঠ থেকে ঠেসে ঘাস খেয়ে আসে, ঘরে এসে সারা রাত তার চিবুনি চলে। উট থলি ভরে জল রাখে, ঠেকামত কাজ চালায়। আর আমরা—গলার নীচে মাল ঠেলে দিয়েই খালাস। শুনতেই মানুষ—আসলে পশুদেরই সুবিধে বেশী।"

দেখিলাম, এ-বিষয়ে ফণীর সঙ্গে প্রায় সকলেই একমত।

উপেন দাস বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিলেন—"কিন্তু সাপ-ব্যাঙ এরা তো ছ'মাস না খেয়ে থাকে।"

কথা শেষ করিতে অবসর তাকে দেওয়া হইল না।

—"তা হলেও নয় বুঝতাম যে, এদিক দিয়ে না হোক অন্য দিক দিয়ে আছি। ছ'মাসের খাবার হাঙ্গামা থেকে বাঁচা যেত—সেও তো একটা লাভ হোত।" বলিয়া ফণী আহারে মনোনিবেশ করিল।

মাস্টার-মহাশয় কহিলেন—"দেখ তো নেপাল, দু'একটা ঠ্যাং পাও কিনা।"

ফণী খাইতে খাইতেই কহিল—"কি, ঠ্যাং? উহুঁ, মুরগীতে ঠ্যাং থাকে না, জানেন না বুঝি? বিশ্বাস না হয় টেনাকে আর উপেনকে জিজ্ঞাসা করুন।"

যতীনদা জাগিয়া উঠিলেন—"ও তাই ব-লো। দু'জন তো রান্না-ঘরেই সারা সময় ছিল। কাজ এগিয়ে রেখেছে দেখছি।"

উপেন দাস পঞ্চাননবাবুর দিকে আড়চোখে চাহিতেই যতীনদা কহিলেন—"ও, তুমিও ছিলে বুঝি?"

ফণী চাপা-আক্রোশে কহিল—"না, উনি থাকবেন কেন, থাকব আমি। রান্নাটা পর্যন্ত শেষ করবার তর সয়নি। পেয়েছেন যে এই যথেষ্ট, আবার ঠ্যাংও"—বলিয়া মাস্টার-মহাশয়কে সান্ত্বনা দিল।

পঞ্চাননবাবু চোখে-মুখে নির্দোষীর ছবি আঁকিয়া লইয়া কহিলেন—"বাঃ রে, আমি কি করব। ডেকে নিয়ে গেল যে—"

—"তা ঠিক, তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। ডেকে নিয়ে গেলে কি আর করবে। সত্যই তো, বিপদে পড়লে কিইবা করার থাকে।"

বাইরে বৃষ্টির জোর উত্তরোত্তর বেশ বাড়িতেছিল। আকাশে যে কত জল আছে, আজ ঢালিয়া বুঝাইয়া ছাড়িতেছে।

নেপাল টেনাবাবুকে কহিল—"বাবু যে কিছুই খালেন না। আর একটু মাংস দেই—কেমন?"

টেনাবাবু কহিলেন—"নারে, আর জায়গা নেই।"

ফণী কহিল—"এতক্ষণ যে ছিল, এই আশ্চর্য।"

ন্যায়তঃ অঙ্ক-শাস্ত্রানুযায়ী যে-কয়খানা ঠ্যাং তার প্রাপ্য হইত, তাহা প্রাপ্ত না হওয়ায় ফণীর ক্ষোভ যে কত গভীর ছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম।

ভোজন-পর্ব প্রায় শেষে আসিয়া ঠেকিয়াছে, সব যোদ্ধাই রীতিমত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন উঠিয়া বিছানায় গিয়া পড়িতে পারলেই বাঁচেন।

তখন ক্ষিতীশবাবু (চক্রবর্তী) কহিলেন—"নেপাল, আছে তো?"

—"আছে বাবু।"

বুঝিতে না পারিয়া আমরা উৎসুক হইয়া রহিলাম। নেপাল বড় একটি বাটি দুধে ভরিয়া আনিয়া ক্ষিতীশবাবুর সম্মুখে ধরিয়া দিল। সকলেই রীতিমত আঁৎকাইয়া উঠিলেন—লোকটা খেপিল নাকি, নইলে এ আত্মহত্যার সাহস কেন করিতেছে?

টেনাবাবু কহিলেন—"মাংসের পরে দুধ খাবেন?"

ক্ষিতীশবাবু জানাইলেন যে, সেইরূপই তাহার অভিপ্রায়। ক্ষিতীশবাবু শৈশবেই মা ও বাবা দু'জনকে হারান, তখন তাঁর বয়স দিন কয়েক মাত্র। থাকার মধ্যে ঠাকুরদাদা ছিলেন। বয়স বাড়িলে পৌত্রের গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া পিতামহ অতিষ্ঠ হইয়া প্রায়ই মন্তব্য করিতেন যে, কুঁড়ে গরু খইল খাবার যম' খইল-ভক্ষণে ক্ষিতিশবাবু সত্যই যম-সদৃশ কিনা, দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। কিন্তু দুধে ও কদলীতে তাঁর আসক্তি ও রুচি সত্যই অদ্ভুত

ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া আজ রাত্রের আহারেও দুধ-খাওয়া—আমাদের যেন একটু বিশেষ বাড়াবাড়ি মনে হইল।

দুধে ডুবাইয়া ক্ষিতীশবাবু সবেমাত্র আঙ্গুল কয়টি উপরে তুলিয়াছেন, ফণী আবিষ্কার করিল—"এ্যাঁ, দুধ কোথায়? এ যে দেখছি ক্ষীর।"

ক্ষিতীশবাবু কহিলেন—"খাবেন? নিন না।"

—"আবার দুধ খাব? দিন, অদৃষ্টে কি আছে ভগবানই জানেন।"—বলিয়া ফণী একটা বাটী আগাইয়া দিল।

কদলী কয়টি আয়তনে যেমন বৃহৎ ছিল, রং-এ তেমনি মনোহর ছিল। দেখিয়া লোভ হয় বটে, কিন্তু গ্রহণ করিবার সাহস বা অবস্থা কোনটাই আমাদের ছিল না। ফণী ও ক্ষিতীশবাবু তাহা নিয়া লড়িতে লাগিলেন—আমরা দ্রষ্টা হইয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ চোখ মেলিয়া বসিয়া রহিলাম।

ক্ষিতীশবাবু অবশিষ্ট কদলীগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছোটখাটো একটি বক্তৃতা করিলেন। তার সারমর্ম ছিল—কোন্ গৃহস্থ-বাড়ীর ঘরের কোণে কোন্ কদলী-বৃক্ষে ইহারা জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা অবগত নহি। কত বৃষ্টিতে ভিজিয়া এ রস-পুষ্ট হইয়াছে, রৌদ্রে পুড়িয়া পরিপক্ক হইয়া সোনার রং পাইয়াছে এবং ভিতরের রস দানা বাঁধিয়া মিষ্টি হইয়াছে—ভাবুন দেখি। বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলি দিনরাত লোলুপ দৃষ্টি নিয়া একে চোখে-চোখে রাখিয়া পাহারা দিয়াছে। কিন্তু একদিন নিষ্ঠুর গৃহস্থ একে ধাবালো অস্ত্রে কাটিয়া লইয়া সহরের বাজারে বিক্রয় করিয়া গেল, তারপরের ইতিহাস তো আপনাদের সম্মুখেই বর্তমান। হায় সুন্দরী রম্ভা, কোন নিভৃত পল্লীর ততোধিক নিভৃত গৃহ-প্রাঙ্গণের একধারে তুমি ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলে, আর আজ লোভীর লোভ তোমাকে তোমার আশ্রয় হইতে ছিনাইয়া আনিয়া কোথায় কোন্ পরিণতি ও সর্বনাশের মধ্যে ফেলিয়া গেল।

আমরা 'হিয়ার-হিয়ার' বলিয়া আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। ফণী

উঠিতে উঠিতে কহিল—"নেপাল, ওধারের জানালাটা দয়া করে খোলা রেখেছ তো, যাতে বৃষ্টির জল বিছানা পত্তর সব ধুইয়ে দিতে পারে?"

—"না বাবু, খোলা রাখব কেন? বৃষ্টি আসতেই বন্ধ করে দিয়েছি।"

জেল-গেটের ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বাহিরে বৃষ্টির বিরাম নাই—বিছানায় শুইয়া তার ধারাপতন-শব্দ শুনিতেছিলাম। চোখে ঘুম ছিল না। আকাশে মেঘে মেঘে ধাক্কা লাগিয়া গুরুগুরু-ধ্বনি উঠিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ আকাশে চমক দিতেছে, তার আলো বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়া ঘরে আসিয়া অন্ধকারকে পলকের জন্য ফ্যাকাশে করিয়া দিয়া যাইতেছিল। ব্যাঙের ডাকেরও ক্লান্তি ছিল না। বৃষ্টিতে ভিজিয়া উৎসাহ তাদের বাড়িয়াছিল, জানালার ওধারে ঘাসের উপর আসিয়াই বর্ষায় এ-গায়ককুল জমায়েৎ হইয়াছে বুঝিলাম।

"এক দুই তিন...আসামী জানালা-বাতি ঠিক আছে—আট নম্বর।" অর্থাৎ ঘোষণা করা হইতেছে যে, আট নম্বরের এতজন কয়েদী ঠিক আছে; বাতিও ঠিক আছে—কোন অগ্নিকাণ্ড বা অপকর্ম ঘটে নাই এবং জানালাও তেমনি ঠিক আছে, ভাঙিয়া কেহ পলায়ন করে নাই। ঘুমের মধ্যেই কয়েদীদের সর্দার সমস্ত গণিয়া ও দেখিয়া লইবার অভ্যাস আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে, তাই সতর্ক ও হুঁশিয়ার-শব্দ নিয়মিত হাঁকিয়া লইতে কোন বাধা করিতেছে না। কান পাতিয়া ঐ টানিয়া-টানিয়া ও চেঁচাইয়া-বলা গণনা শুনি। পাশের লোহার খাটে মশারি ফেলিয়া উপেনবাবু ঘুমাইতেছেন, জোয়ার-ভাঁটার মত তার নাসিকা-গর্জন বাতাসে দোল খাইতেছে। ভয় হইল, এই নাসিকা-ধ্বনিতে বাহিরের ভেককুল ঘরের মধ্যে আত্মীয়ের সন্ধানে না আসিয়া পড়ে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ এক ঝলক আলোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহিরের অন্ধকারের বুকে যেন বর্শা বিদ্ধ করিয়াছে, তাই রক্ত-ধারার মত আলোক পিচকারির বেগে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য মাত্র—কারণ, পলকেই অন্ধকারের ক্ষত-মুখ বন্ধ হইয়া যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বাজ-পড়ার মত শব্দ, লোহার খাটটা পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠে।

পাশ ফিরিয়া ভালো করিয়া চাদরে গা মুড়িয়া লইয়া ঘুমের চেষ্টা করিলাম।

এরা সবাই তো বেশ ঘুমাইতেছে। একই ঘরের মধ্যে রহিয়াছি, আমার খাটের নিকট আসিতে নিদ্রার এমন ভয় বা লজ্জা কেন। মশারি ফেলা আছে, তাই ঢুকিতে পারে না? সকলেরই তো মশারি ফেলা। কে ঘুমকে বন্দিনী করিয়াছে যে আসিতে পারিতেছে না? কিম্বা আমার খাটের চারি-পার্শ্বে মন্ত্র পড়িয়া কোন অদৃশ্য নিষেধ-রেখা কেহ কি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে যে, ঘুম এ-গণ্ডী কিছুতেই পার হইতে পারিতেছে না? ঘুমের মাসী-পিসী এরা সব কোথায়, ঘুমের এ-দুর্দিনে বোনঝিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন না কেন?

কানে যেন কেমন একটা শব্দ আসে। কান্নার মতই মনে হয়। কে আবার কাঁদে? জেলের এ-ঘরটাও কি সেই ক্ষুধিত-পাষাণ হইয়া আছে? অসম্ভব কি! কত হতভাগ্য এখানে অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ও কান্না রাখিয়া গিয়াছে, তার ইয়ত্তা আছে নাকি! কান-খাড়া করিয়া কান্নাটাকে ভালো করিয়া ধরিতে গেলাম এবং ধরিতে পারিলামও।

মশারি তুলিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখি ও-ধারে একটা খোলা-জানালায় কে একজন গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের অন্ধকার ও বৃষ্টির দিকে চাহিয়া আছে।

একটু অগ্রসর হইতেই ভুল বুঝিতে পারিলাম—এ কান্না নয়, গান। পদ পর্যন্ত বুঝা যাইতেছে—"বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে।" ফণী জানালায় দাঁড়াইয়া গান করিতেছে। দিনের বেলা সাহস হয় নাই, রাত্রে সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তায় এই ভয়ানক বৃষ্টি—কেহই শুনিতে পাইবে না মনে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সঙ্গীত সাধনা করিতেছে।

গানে হৃদয়ের ভাব আবেগ খুব ভালোভাবে মুক্তি পায়, সে বিশ্বাস আমারও আছে। কিন্তু এমন চাপা গলায়, মানে নাকে গাহিতেছে

কেন? ইহাতে আবেগগুলি বাহির হইতে সুবিধা পাইতেছে কি? পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম, কহিলাম-"বেশ গাস্‌ কিন্তু। আর আবহাওয়াটিও কেমন যুৎসই। উঃ, রাত্রির বুকফাটা কান্না যেন তোর গানে বেরুচ্ছে। শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম, থাকতে পারলাম না, উঠে এলাম। কিন্তু আস্তে কেন, চেঁচিয়ে গলা ছেড়ে গা না।" বলিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

শেষে কহিলাম—"তোকেও এ-রোগে ধরল?"

ফণী খেপিয়া গেল, কহিল--"না ধরে উপায় আছে। দশজনে তো ষড়যন্ত্র করে ঢেঁকি গিলিয়ে ছেড়েছেন, এখন অনুরোধের ঠেলা সামলাচ্ছি আমি। পেটের মধ্যে কোনমতে জায়গা করে আপোষে শান্ত হয়ে থাক, তা না লড়াই লাগিয়েছেন কে কতটা বেশী জায়গা দখল করতে পারেন। আরে, পেটটা তো আমার রবারের থলি নয় যে, ভিতর থেকে যত গুতো মারবি ততই জায়গা বাড়বে। আজ ঘুমের দফারফা। উঠে এসেছি, দেখি গান শুনে যদি শান্ত হয়ে ঠাণ্ডা মারে।"

—"এ গানে ঠাণ্ডা না হয়ে উপায় আছে। জোর করে গা দেখি, কেমন লড়াই না থামে।"

—"পাগল হয়েছিস, গানের কর্ম নয়। নিশ্বাস নেবার মত জায়গা পর্যন্ত এরা ছাড়তে চায় না। কষ্টে কোনমতে বাতাস ভেতরে নিচ্ছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঠেলা মেরে ফিরিয়ে দিচ্ছে।"

হাসির শব্দ পাইলাম। পঞ্চাননবাবুর গলা। কহিলাম--"তুমি জেগে আছ, ঘুমওনি?"

পঞ্চাননবাবু উত্তর দিবার আগে ফণী কহিল—"ঘুমুলে যে অপূর্ব সঙ্গীত শোনা হয় না। খোঁজ নিয়ে দেখ, মশারির তলে সবাই ওৎ পেতে আছেন। নিশ্চিন্দি হয়ে নিরিবিলি যে গান গাব তার যো নাই।"

দেখিলাম, সত্যই সবাই জাগিয়া আছেন এবং এই স্বর্গীয় সঙ্গীত মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন। পঞ্চাননবাবু কহিলেন—"তুই তো সব মাটি করলি। আরম্ভ করতে না করতেই উঠে এলি।"

অপরাধ স্বীকার করিলাম। সত্যই মস্ত ক্ষতি করিয়া ফেলিয়াছি।

এই নাকি-সুরের 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে'—শুনিবার সৌভাগ্য আর হইবে না। সুযোগ জীবনে কি বারবারই আসে? না, আসে না।

একে একে সবাই বাহির হইয়া আসিলেন। আলো কয়টা জ্বালা হইল। এতক্ষণে উপেন দাস জাগিল, কহিল—"কি ব্যাপার কি? এই রাত্‌দুপুরে পাশা? কি অলক্ষুণে কান্ড, বাবা"—বলিয়া শতরঞ্জির উপর আসিয়া চাপিয়া বসিল।

এক সময়ে রাত তিনটার ঘণ্টা জেল-গেটে বাজিল। এতক্ষণে চোখের পাতা আমাদের ভারী-ভারী ঠেকিতে লাগিল। খেলা বন্ধ করিয়া আলো নিভাইয়া বিছানায় গিয়া সবাই টান হইলাম। এবার আর ঘুমের জন্য জাগিতে হইল না। ফণী পর্যন্ত গভীর ঘুমে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। বাহিরে কিন্তু বৃষ্টি তেমনি অবিশ্রান্ত ঝরিতে লাগিল।

* * * *

১৯৩০ সাল, ভারতবর্ষ সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সে-ঢেউএ ইতিমধ্যেই এ-জেলে শ' আড়াই সত্যাগ্রহী কয়েদী আনিয়া ফেলিয়াছে। নিত্য নূতন লোক আসিতেছে—জেলের যেন সে এক উৎসব দিন। বন্ধুদের কাজ জুটিয়া গেল। তারা বন্দীদের নিয়া ব্যস্ত হইয়া রহিলেন, স্নানাহারের সময় পর্যন্ত তারা পান না। জেলের আইন রীতিমত শিথিল হইয়া উঠিল। আমরা রাত দশটায় বন্ধ হইতাম। জমাদার তালাবন্ধ করিতে আসিয়া দেখিত যে, নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই।

জিজ্ঞাসা করিত—"পঞ্চাবাবু কিধার গিয়া।"

ফণী কহিত—"পঞ্চাবাবু স্বদেশী করতে ওই ধারকা নম্বরমে গিয়া। দেখগে, জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে স্বদেশীবাবুদের সঙ্গে আলাপ করতে হ্যায়।"

জমাদার হাসিয়া ফেলিত, বলিত—"পঞ্চাবাবু হামার নকরী খাইয়ে ছাড়বেন।"

পঞ্চাননবাবু যখন ফিরিবেন তখন যেন তাকে খবর দেওয়া হয়,

আসিয়া তালা খুলিয়া দিয়া যাইবে বলিয়া জমাদার চলিয়া যাইত। পঞ্চাননবাবু কোনদিন রাত একটায় কোনদিন দু'টায় বন্দী হইবার জন্য ব্যারাকে ফিরিতেন।

কিন্তু এ সুখ-সুবিধা শেষে আর ছিল না। সত্যাগ্রহীদের উপর মারপিট করা হয়, বাধা দিতে গিয়া ডোর্টিনিউরাও আহত হয়, পঞ্চাননবাবুকে ঘণ্টাকয়েকের মধ্যেই এই জেল হইতে অন্য জেলে বদলি করা হয়—এসব ঘটনা আমি পরে জানিতে পারি, কারণ এর আগেই আমি সিউড়ি জেলে চালান হইয়া আসিয়াছিলাম।

একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল। তখন পর্যন্ত জেলে সত্যাগ্রহী-বন্দী জনকতকের বেশী আসে নাই, আমরাও মাস দেড়েকের মত হয় আসিয়াছি।

জামা-কাপড় ও অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের জন্য তাগাদা দিয়া আমাদের ম্যানেজার ক্ষিতীশবাবু ক্লান্ত হইয়া হাইল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। জেলার দেখা হইলেই বলিতেন—এই আজকালের মধ্যেই সব আনিয়া দিবেন। আজ আর কাল গড়াইয়া মাসখানেক গেল বিছানা-বালিশ ইত্যাদি না হয় নাই আসিল, খাটে কম্বল আর হাসপাতালের চাদর বিছাইয়াই কাজ যেমন চলিতেছে তেমন চলিতে পারে। কিন্তু কাপড়ের কাজ তো আর কম্বল পরিয়া চলিবে না। গা ঢাকিয়া ভদ্র হইবার জন্য কয়েকটা গেঞ্জিও তো আবশ্যক। জেলারবাবু সবই বুঝিতে পারেন দেখিলাম। কিন্তু জিনিসগুলি আনাইয়া দিতে কেন যে পারিতেছেন না, এ-দ্রব্যগুলি বাজারে বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে কিনা, কিম্বা এগুলি আমাদের হস্তগত হইলে ইংরেজ সরকারের আর রক্ষা থাকিবে না—এসব কোন কিছুই ঠাহর করিয়া উঠা গেল না। কিন্তু আমাদের ধৈর্যের সীমা ইতিমধ্যেই শেষ হইয়া উঠিল।

ক্ষিতীশবাবু পরিষ্কারই জানাইলেন—"পারেন তো আপনারাই জিনিসপত্তর আদায় করে নেবেন, আমাকে দিয়ে ও-কাজ হবে না। কাহাতক পারা যায়—গালাগালি দিলে পর্যন্ত হুঁশ হয় না। বিশ্বেস করবেন না, শালা পর্যন্ত বলেছি। কিন্তু কোন কাজেই এল না।"

কয়েদী কাঙ্গালী পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। চটিয়া গিয়া জেলারের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ পাতাইয়া যাহা কহিল, তাতে এত রাগের মধ্যে ক্ষিতিশবাবুও হাসিয়া ফেলিলেন। কাঙ্গলী জানিতে চাহিল যে, জিনিসগুলি কি জেলারের পিতার সম্পত্তি দিয়া ক্রয় করিতে হইবে যে, সে এমনতর তাল-বাহনা করিতেছে। বলার মত বলিলে পিতা-পিতা বলিয়া জিনিস পৌঁছাইয়া দিবার সময় পাইবে না। ভদ্রমানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করি—তাতে কাঙ্গালীর আপত্তি নাই! কিন্তু জেলার ভদ্রলোক নহে, আসলে সে চামার—এ গোপন সম্বাদও সে আমাদিগকে জানাইয়া দিল।

পরদিন ভোরের ব্যাপার।—জেলের অন্যান্য অংশ পরিদর্শন শেষ করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদের নম্বরে আসিলেন, সঙ্গে জেলার, ডেপুটি জেলার, নায়েব, হাসপাতালের ডাক্তার, জমাদার ও কয়েকজন সিপাহী। বারান্দা হইতে কথা বলিতে বলিতে তিনি এক সময়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন। আমরা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে শ্রদ্ধা করিতাম। বয়স্ক মানুষ, চোখেমুখে একটি উদার শান্তভাব, যখনই আসিতেন তখনই আন্তরিকতার সহিত আমাদের সুখ-সুবিধার খোঁজখবর নিতেন। আমাদের জন্য তাঁর স্নেহ এমন অকপট ছিল যে, ব্যবহারে তাহা গোপন থাকিত না। সরল ও উদার এই বয়স্ক বাঙ্গালী সিভিল সার্জনের জন্য আমাদের শ্রদ্ধা কোন কারণেই নষ্ট হইবার সুযোগ ঘটে নাই। এঁর আলোচনা দীর্ঘদিন পরেও বক্সা ও দেউলীতে বসিয়া শ্রদ্ধার সহিতই আমরা করিতাম।

সুপার দল সহ ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাননবাবু দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। এজন্য আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না, কারণ তাঁর কি অভিসন্ধি ছিল তাহা পূর্বাহ্নে আমরা কেহই জানিতে পারি নাই। সুপার জিজ্ঞাসা করিলেন—"দরজা বন্ধ করলেন যে?"

আমরাও কারণ জানিতাম না, তাই পঞ্চাননবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

পঞ্চাননবাবু কহিলেন—"স্যার, আপনার জেলার আমাদের এখানে confined থাকবেন।"

—"কেন?"

—"আপনি জানেন না, স্যার, আপনার জেলার কি-জাতীয় লোক। একমাস তাগাদা দিয়েও কয়েক জোড়া কাপড় পর্যন্ত আদায় করতে পারিনি।"

—"কেন, আমি তো অনেক আগেই আপনাদের অর্ডার সই করে দিয়ে দিয়েছি। আপনারা জিনিস পান নি?"

—"আপনার জেলারকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

সুপার জেলারের দিকে চাহিতেই জেলারবাবু ঘরের মধ্যে উন্মাদের মত পায়চারী করিতে করিতে যাহা উত্তর দিলেন, তাহার সারমর্ম এই যে—অন্যের উপর ভার দিয়া তিনি অখাদ্য-ভক্ষণকারীর কাজ করিয়াছেন, আজই রাত্রের গাড়ীতে তিনি স্বয়ং কলিকাতা যাইবেন, পরশ্ব-তারিখ ভোরে এই সময়ে মাল আমাদের নম্বরে পৌঁছাইয়া দিয়া তবে তিনি জলস্পর্শ করিবেন, এ যদি তিনি না করেন তবে তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান নহেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখিলাম, জেলার অত্যন্ত ভয় পাইয়া গিয়াছেন। ভয়-জিনিসটা এমনই সংক্রামক যে, এক সুপার ব্যতীত সবাই আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল, সিপাহীদের মুখে পর্যন্ত ভয়ের চিহ্ন। বিশেষ করিয়া জেল-হাসপাতালের বেঁটেখাটো ডাক্তারটি দেখিলাম ঘাবড়াইয়াছেন বেশী, তিনি দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রীতিমত কাঁপিতেছিলেন।

সুপার পঞ্চাননবাবুকে শুধু ভালোই বাসিতেন না, শ্রদ্ধাও করিতেন। কহিলেন—"পঞ্চাননবাবু আপনার জিনিস পাবেন, আমাদের যেতে দিন।"—স্বর একটু গম্ভীর ঠেকিল।

পঞ্চাননবাবু কহিলেন—"স্যার আপনাকে detain করার ইচ্ছা আমার মোটেই নাই। আপনার সামনে এটা ঘটে, এ আমার ইচ্ছা ছিল না।—ফণী দরজাটা খোল। স্যার, আমাকে বিশ্বাস করবেন, আপনাকে আমি ধরে রাখিনি।"

ফণী দরজার পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল. দরজাটা ঈষৎ উন্মুক্ত করিল।

কিন্তু সুপার একটুও নড়িলেন না, শান্তভাবে বলিলেন—"পঞ্চাননবাবু, I want to take my Jailor with me. আমার জেলে আমাকে আপনি দশ মিনিট আটক করে রেখেছেন—আপনি কি মনে করেন না যে, you have gone too far?"

পঞ্চাননবাবু উত্তর দিলেন না।

সুপার আবার বলিলেন—"আমার জীবনে এতবড় অসম্মান কেউ আমাকে করেনি, আপনি আজ যা আমায় করলেন। আমাকে ছেড়ে দিন, আমি যাই।"

ভদ্রলোকের চোখে জল আসিয়া পড়িল।

পঞ্চাননবাবু কহিলেন—"স্যার, আপনাকে কেউ আটকায়নি। আপনার দরজা খোলা আছে, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।"

—"না, আমি জেলারকে নিয়ে যেতে চাই।"

—"আমাকে মাপ করবেন, আমি জেলারকে যেতে দিতে চাই না। কয়েদীদের সঙ্গে ব্যবহার করে করে স্বভাব এদের এমন হয়েছে যে, মানুষ বলে কাউকেই মনে করেন না। এ ভুল-ধারণা ভাঙবার দরকার হয়েছে। আমাকে আপনি অনুরোধ করবেন না, জেলার এখানেই থাকবেন। জিনিসপত্তর পাওয়ার সঙ্গেই তিনি যেতে পারবেন, এক মিনিট বেশী আমি তাকে ধরে রাখব না।"

অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছিল। জেলার এই কথাবার্তার মধ্যেও ছটফট করিয়া ঘরের মধ্যে হাঁটাও বন্ধ করেন নাই, কিম্বা নিজের কথাও থামান নাই—কৈফিয়ৎ ও প্রতিশ্রুতি সমানভাবে দিয়া চলিয়াছেন। সুপার গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পঞ্চাননবাবুও তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুই পক্ষের একপক্ষ নরম না হইলে এ-অবস্থার পরিণতি যে কি হইবে, ভাবিয়া আমরা চিন্তিত হইলাম। পঞ্চাননবাবুকে চিনি, সেদিক দিয়া কোন সুবিধা হইবে না। আর সুপারই বা জেলারকে এদের হাতে রাখিয়া কেমনে যান।

যতীনদা অগ্রসর হইয়া কহিলেন—"স্যার, জেলারবাবুর উপর বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা আমাদের নেই। আপনি যদি কথা দেন যে, আজ হোল সোমবার, সামনের বুধবার রাত্রের ভিতর আমরা আমাদের দরকারী জিনিসগুলি পাব, তবে আমি পঞ্চাননবাবুকে বলে দেখতে পারি।"

সুপার কথা বলিবার আগেই জেলার আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—"আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, কথা দিচ্ছি, নিজে কলকাতা থেকে মাল এনে আপনাদের দিয়ে যাব।"

যতীনদা তাহাকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন—"থামুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথাই হয়েছে, এঁর সঙ্গে কথা বলছি, আপনি চুপ করুন।"

সুপার কহিলেন—যতীনবাবু, you shall get your articles by Wednesday."

যতীনদা কহিলেন—"পঞ্চানন, তবে এঁরা যেতে পারেন, কি বল?"

পঞ্চাননবাবু কহিলেন—"স্যার, যতীনদা কথা দিয়েছেন, বাধ্য হয়েই আপনার জেলারকে ছেড়ে দিতে হোল। আপনার জেলারকে kindly একটু সতর্ক করে দেবেন যেন এরকম unpleasant কাজ আমাকে আর না করতে হয়।"

তারপর একটু থামিয়া কহিলেন—"আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। বিশ্বেস করবেন যে, আপনাকে অসম্মান করার মত ইচ্ছা আমাদের কারু নাই, কোনদিন হবে না। আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি।"

সুপার শেষের দিক হইতেই গম্ভীর হইয়া গিয়াছিলেন। কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। বারান্দা হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিলেন—"আপনাদের articles আপনারা ঠিক সময়েই পাবেন।"

জেলারকে বলিলেন—"যে কোন রকমেই হোক বুধবারের ভিতর

মাল পৌঁছে দেবেন",—বলিয়া দল হইতে একটু আগে একাকী আমাদের কম্পাউন্ড হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

*　　*　　*　　*

বর্ষা শেষ হইয়া শরৎ আসিয়া পড়িল, পূজোর আর মাসখানেক বাকী, এমন সময় ফরিদপুর-জেল হইতে সিউড়ি-জেলে আমাকে স্থানান্তরিত করা হয়। বন্ধুদের এই ভরা-হাটে আমিই প্রথম ভাঙ্গন আনিলাম। বিদায় দিতে অনেকেই ব্যথা পাইলেন, কিন্তু পিছনে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। ম্লানমুখে জেলগেটে তাঁহারা দাঁড়াইয়া রহিলেন, নূতন গৃহের উদ্দেশ্যে আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।

এক জেল হইতে অন্য জেলে যাইতে মনের যে-অবস্থা হয়, তাহা অপরের আন্দাজ করিয়া বুঝা সম্ভব নহে। অনুমান প্রমাণের মধ্যে গণ্য হয় শুনিয়াছি, কিন্তু প্রত্যক্ষের কিছু প্রতিধ্বনি না থাকিলে কোন অনুমানই প্রমাণে উন্নীত হয় না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া মনের সে-অবস্থা জানার অন্যপথ নাই।

এক ইংরেজ সাহিত্যিক জীবনকে একটি পাখীর সহিত তুলনা করিয়াছেন—বাহিরের অন্ধকার হইতে এক দরজা দিয়া আলোকিত কক্ষে এ-পাখী আসে, কিছুক্ষণ পাখা ঝাপটাইয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, পরে একসময়ে আর এক দরজা দিয়া বাহিরের তেমনি অন্ধকারে মিলাইয়া যায়। এর সঙ্গে আমাদের মিল আছে, কিন্তু অন্য রকমের। পাখীটি অনন্ত অন্ধকার হইতে ক্ষণিকের আলোকে আসে —আমরা খণ্ড আবদ্ধ আবেষ্টনী হইতে ক্ষণিকের অসীমতায় আসি, আবার এক সময়ে সেই লৌহ-আবেষ্টনীর ক্ষুদ্র আবদ্ধতায় গিয়া আশ্রয় নেই। পাখীটি মুক্তি হইতে বন্ধনে আসিয়া পড়ে—আমরা বন্ধন হইতে উন্মুক্ততায় আসি। এই ক্ষণকালের মুক্তি আস্বাদনে মনের যে-অবস্থা হয়, তাহা অপরের অনুমান করিয়া বুঝা সম্ভব নয়, এই আমার ধারণা। আমি নিজেও তো বহুবার 'বন্ধন হইতে মুক্ত হইল' এ জাতীয় কথা ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু আজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমরা যে-সমস্ত কথা ব্যবহার করি তার সঠিক

অর্থ জানি না এবং যাহা সত্য বলিয়া জানি, তাহা আসল-জানা হইতে বহুক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র ও ভুল-জানাই থাকিয়া যায়।

জেলখানা হইতে বাহির হইয়া এই এতদিনের জানা-পৃথিবীকে একেবারে নূতন মনে হয়। বহুদিন রোগে ভুগিয়া একটি ঘরে যাকে থাকিতে হইয়াছে, সে যখন বাহিরে আসিয়া প্রথম সুস্থ চোখে পৃথিবীকে দেখে তারও তখন পৃথিবীকে একটু নূতন নূতন লাগে। কিন্তু তার সঙ্গে আমার অবস্থার ভয়ানক একটা ব্যবধান আছে। তার মনে কোন প্রচ্ছন্ন ও পীড়াদায়ক জ্ঞান থাকে না, তার সমস্ত আস্বাদনের পিছনে কেহ বার বার একথা স্মরণ করাইয়া দেয় না যে—তাড়াতাড়ি কর, একে এখনই তোমার চোখের ও মনের আড়ালে সরাইয়া নেওয়া হইল বলিয়া। এক চোখে কেবল জল গড়াইয়া পড়িবে, অন্য চোখে হাসির আলোক খেলিয়া যাইবে—এমনই কঠিন সে মানসিক পরীক্ষা।

মন যে কত লোভী ও পিপাসী হইয়া উঠিয়াছে, যাত্রার এই অবকাশটুকুর মধ্যে তাহা টের পাই। এত লোভ যে এই মনেই গুপ্ত ছিল, জেলে থাকাকালীন একদিনও সন্দেহ করি নাই. কিন্তু বাহিরের মুখোমুখী আসিতেই এরা সব কোথা হইতে এত উগ্র ক্ষুধা নিয়া বাহির হইয়া আসে। মনে হয়. কতকাল যেন মানুষের সঙ্গ পাই নাই।

ট্রেনের জানালা হইতে দেখিতে পাইয়াছিলাম যে. লাইনের পাশে খালের জলে কয়েকটি মেয়েছেলে মাছ ধরিতেছে, বোধ হয় সাঁওতাল হইবে। খোলা গা. কাপড় হাঁটু পর্যন্ত তোলা। উপরের আকাশ ও নীচের এই নির্জন মাঠের মতই তারা সহজ ও নগ্ন। ট্রেন লৌহ-পথে ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছে. মৎস্য-শিকারীর পিছনে সীমান্তে সরিয়া গেল।

মানুষের মন--সাড়ে তিন হাত শরীরের মধ্যে কোথায় যে সে বসিয়া আছে জানি না। সে-মনকে চোখে দেখা যায় না, হাতের মুঠায় ধরা যায় না—অথচ এই দেহেই সে রহিয়াছে। শরীরে থাকিয়াও সে শরীরী নয়। কিন্তু সেই অশরীরী মন এত লোভ. এত কামনাকে

আশ্রয় দিয়া রাখে কেমনে, যার জন্য সমস্ত জীবন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়া মানুষ ছুটিতে বাধ্য হয়! কোথায় কতদূরে ওরা মাছ ধরিতেছে, চোখের দেখায় তার শেষ হয় না, মনের কাছে সে সম্বাদ পেঁাছিতেই এ-কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখি! একপাল পশু যেন এতকাল শিকলে বাঁধা থাকিয়া অনাহারে উপবাসে শুকাইয়া নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। তাদের শিকল খুলিয়া লওয়া হইয়াছে, ছাড়া পাইয়াই ছুটিয়াছে, সম্মুখে যাহা পাইবে ধারালো নখে ও দাঁতে কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া লইবে।

কিন্তু জানিতে ইচ্ছা করে, এ-ক্ষুধার কোন অর্থ আছে কি? যে-লোভ মনের মধ্যে প্রেত-মূর্তির মত বিচরণ করিতেছে, সে-লোভ বাহিরের বস্তু দেখিয়া জিভ্ বাহির করিতে চায় কেন? ভিতরের জিনিস বাহিরে আসিতে পারে কি? মন নিজেই তো শরীরে আবদ্ধ। নিজের চিন্তা, আশা, ইচ্ছা ইত্যাদির মধ্যেই সে বিচরণ করিতে পারে। সেই মন কিম্বা তার লোভ বাহিরে আসিবার জন্য এমন ছট্‌ফট্ করিয়া মরে, এ ব্যর্থ শক্তি ব্যয় কেন হয়? আমার শত ইচ্ছা থাকিলেও তো আমার মন বাহিরে গিয়া ওদের সান্নিধ্য পাইতে পারে না।

বস্তু-জগৎ পড়িয়া আছে, তার আড়ালে বা উপরে ইন্দ্রিয়-জগৎ থাকিতে পারে, মানে আমি বড়জোর চোখ মেলিয়া দেখিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়ের বিষয় করাই কি তবে বস্তুকে অযত্ত করা? তাহা হইলেই কি দেহাবদ্ধ মন মুক্তি পায়, অশরীরী কামনাগুলি শরীরী হইয়া উঠে? কে জানে!—আমি শুধু জানি কোথায় কোন দেখা-শোনা-ছোঁয়ার জিনিস রহিয়াছে—চোখ-কান এরা তো দেখিয়া শুনিয়াই খালাস, এর বেশী আগাইতে পারে না—আর শরীরের মধ্যে যে-জিনিসটার শরীর নাই, যাকে 'আমি' বলিয়া জানি, যাকে 'মন' বলিয়া বুঝাইয়া থাকি, সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সে কে, কি তার পরিচয়- এ আমি জানি না।

চোখের আড়ালে থাকিয়া আমি পৃথিবীকে রূপময় দেখিয়া শান্ত থাকি না, চোখের জানালার ওধারে দ্রষ্টা- আমার পাশেই একদল

লোভ-আশা-কামনা মাতালের মত আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। এই আমার শরীরে এতগুলি বিভিন্ন বস্তু আশ্রয় নিয়াছে, যেমন আমিও নিয়াছি। এ-রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার সম্ভাবনা নাই—এ আমি মর্মে মর্মে বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি, এত ক্ষুধা, এত কামনা ও এত লোভ অশরীরী প্রেতের মত মনকে আশ্রয় করিয়া এই শরীরে বাসিন্দা হইয়াছে, এই শরীরকে ধ্বংস পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার আগে তারা বিদায় নিবে না। এই শরীর পুড়িয়া ছাই হইলে হয়ত অন্য কোন শরীরে এই প্রেতের দল ভর করিবে, কিম্বা এই দেহ-ভস্মেই অপেক্ষা করিবে। একদিন হয়তো আকাশ হইতে আহ্বান আসিবে—"ভস্ম-অপমান-শয্যা ছাড়, হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু।" অতনু মন প্রেত-সঙ্গীদলকে নিয়া আবার উজ্জীবিত হইবে—আজ যেমন খালের জলে ওদের দেখিতে পাইয়া এরা মৃত্যু-শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কে জানে, এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডলের প্রত্যেক পরমাণু-কণায় কোন বিরাট-মন তার প্রেতের দলসহ ছড়াইয়া আছে কিনা, যার জন্য ধূলিটির পিছনে পর্যন্ত লোভকে গা নাড়া দিতে দেখি। কোন বিরাট-দেহের চিতার ছাইতে এ পৃথিবী গঠিত হইয়া থাকিবে, তাই প্রতি তনুতে অতনু মনগুলির তনু-পিপাসা দেহাশ্রয় পায়। বোধ হয় অনাদি সময় হইতেই এ রকম হইতেছে। শুধু অনাদি যদি হইয়া থাকে, যদি অনন্ত না হয়—তবে এর বাহিরে যাইবার পথ থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু যার আদি নাই, তার অন্ত থাকিবে—এতবড় বিশ্বাস মানুষ কোন সাহসে করিবে?

* * * * *

আমরা তখন সিউড়ী-জেলে, এমন সময় গুজবটা আসিল। শোনা গেল, সরকার সংকল্প করিয়াছেন যে—জেলে আর সেই সব বন্দীদের রাখা হইবে না যারা ভয়ানক, যাদের জন্য জেলের আইন-কানুন ঢিলা হইয়া পড়ে, যারা সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে মিশিয়া দল পুষ্ট করে এবং বাহিরের খবর দেওয়া-নেওয়া করে। তাদের বাছিয়া নিয়া সরকার সরাইয়া রাখিবেন, জায়গাও ঠিক হইয়াছে। বাংলা ও ভূটানের

সীমান্তে বক্‌সাতে পাহাড়ের উপর সরকারের একটি কেল্লা আছে, বন্দীদের জন্য তাহাই নির্বাচিত হইয়াছে, সেই দুর্গের মিলিটারী-অফিসারের হাতে এদের ভার ন্যস্ত করা হইবে।—কিছুদিন পরে শুনিলাম, যেই কথা সেই কাজ, বক্‌সাতে লোক নাকি চালান শুরু হইয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি-জেল হইতে আমাদের জেলে বদলী হইয়া আসিলেন ডাক্তার জ্যোতির্ময় শর্মা। হউক না রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তবু তিনি রাজধানীর প্রধান জেলের আমদানী বন্দী, পদ-মর্যাদা তার আছে বৈকি। আমরা নূতন সঙ্গীকে ঘিরিয়া লইয়া বসিলাম—"কি বারতা রে দূত!"

তিনি বক্‌সার যে-বর্ণনা আমাদিগকে শুনাইলেন, তাহাতে আমাদের শরীরের কোন কোন যন্ত্রপাতি চমকাইয়া উঠিল। লোকটার মতলব কি? ভয় দেখাইতে ভালবাসেন বুঝি? তবে তো স্বভাব মোটেই ভাল নয় দেখিতেছি। উপরটি যেমন কালো, ভিতরটিও কি তদ্রূপ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ? কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়াও আমাদের ধারণা তেমনি দৃঢ় রহিয়া গেল যে ডাক্তার শর্মা সত্য খবরই কহিতেছেন। কেন, মানুষ কি কোন ক্ষেত্রেই মিথ্যা কথা কহিতে পারে না? সত্য বলিতেছি যে, এ-ক্ষেত্রে যদি শর্মাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিতে পারিতাম, তবেই আমরা খুসী হইতে পারিতাম। সত্য কথার মত কষ্ট-দায়ক ও দুঃখ-দায়ক আর কোন বস্তু নাই, এমনই একটা বিশ্বাস সেদিন আমাদের হইয়াছিল।

অথচ আশ্চর্য এই যে—বক্‌সা যে ভয়ানক স্থান, সেখানে যে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিতে একান্ত বাধ্য, অর্থাৎ তাহার ভীতি-জনকত্ব প্রমাণ হইতে পারে এমন কোন সঠিক কিছু খবর শর্মাও বলিতে পারে নাই, আমরাও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু তবু বক্তা ও শ্রোতা সকলেই আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া রহিলাম যে—"ডিডি ঐ চল্লো।" ভয় যাকে ধরে এমন করিয়াই ধরে যে, অবিশ্বাসের আর কোন জায়গা রাখে না। এমন কি একদিন জেলার ভদ্রলোক পর্যন্ত বক্‌সার

বিষয়ে এমন ভাবে বলিলেন যে, আমরা বুঝিতে পারিলাম যে বন্দীদের শায়েস্তা করিবার আয়োজন সত্যই হইতেছে।

চেয়ারে বসিয়া জেলার এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বক্সার কথা শুনেছেন তো? অদৃষ্টে অনেকের দুঃখ আছে।"

তাঁহাকে জেরা করিয়া কিছু বুঝা গেল যে, তিনিও বিশেষ কিছু জানেন না, তবে শুনিয়াছেন সে নাকি ভয়ানক ব্যাপার।

আমাদের একজন জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা জেলার-বাবু, সৈন্যদের মত দুবেলা প্যারেড করাবে নাতো?"

জেলার চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া লইয়া কহিলেন—"তাতো করাবেই। নইলে ফোর্টেই বা নেবে কেন, আর মিলিটারীর জিম্মায়ই বা দেবে কেন।"

—"আচ্ছা, উঠতে বসতে দেখা হলেই বোধ হয় অফিসারদের সেলাম করতে হবে?"

জেলার তেমনি দ্বিধাহীন জবাব দেন—"তাতো হবেই। মিলিটারী-দের ডিসিপ্লিনই তো সব, ও ভাঙ্গবার যো নাই। তা হলে একেবারে কোর্ট-মার্শাল।"

আর এক বন্ধু জানিতে চাহিল—"নিজেদের বোধ হয় পালা করে পাহারা দিতে হবে?"

জেলার সামান্য একটু ভাবিয়া লইয়া কহিলেন—"বাহিরের গেটে ওরাই থাকবে। ভিতরে নিজেদের পাহারা দিতে হবে, সে তো ধরা কথা।"

ধরা-কথা শুনিয়া প্রশ্নকর্তা চুপ করিলে অপর একজন প্রশ্ন করিল—"সেখানে বোধ হয় ঠাকুর চাকর বা কয়েদী নাই?"

জেলার দুই চক্ষুর উপরের দুই ভ্রূ আর একটু উপরে টানিয়া লইয়া উত্তর দিলেন—"কি ঠাকুর চাকর? পাগল হয়েছেন, ও-সব থাকবে ওখানে! দুর্গের ভিতর কাক-চিলের পর্যন্ত ঢোকার নিয়ম নাই।"

—"তবে রান্না-বান্না কাজ-কর্ম চলবে কেমন করে? তাও কি নিজেদের করতে হবে?"

—"তবে কি না খেয়ে মরবেন? খেতে যখন হবেই, তখন রান্না না করে উপায় কি।"

বলিয়া জেলার-বাবু একমুখ-ধোঁয়া শূন্যের দিকে ঊর্ধ্ব-মুখ হইয়া মুক্ত করিলেন। এই জেলার লোকটিকে আমরা এতকাল ভাল বলিয়াই জানিতাম। এখন দেখিতেছি, তিনি রীতিমত ভয়ানক লোক। অন্যের বিপদে এমন নিশ্চিন্ত হইয়া যিনি চুরুট টানিতে পারেন—যাক, ভগবান আছেন, তাঁর কাছে তো কোন পাপ গোপন থাকে না, তিনিই ব্যাটাকে দেখিয়া লইবেন।

জেলার-বাবু কহিলেন—"আমাদের এখান থেকে কেউ যাবেন নাকি?"

—"কেন, কোন খবর পেয়েছেন নাকি?" আমরা চাপিয়া ধরিলাম।

জেলার উত্তর দিলেন—"খবর এলে জানতেই পাবেন, আমি তো আর যাচ্ছি না—আপনারাই যাবেন।"

বুঝিলাম, আস্ত শয়তানের পাল্লায় পড়িয়াছি। তবু নাছোড়বান্দা হইয়া আমাদের একজন প্রশ্ন করিলেন—"তাতো ঠিকই, যেতে হলে আমরাই যাব, আপনাকে কেন আর টানা-হেঁচড়া করব। সত্যি বলুন, কোন খবর পেয়েছেন কি না?"

এবার জেলার একটু হাসিলেন, কহিলেন—"না, আমরা কোন খবর পাই নি। তবে পুলিশ-ক্লাবে কাল সন্ধ্যায় কথা হচ্ছিল, শুনলাম যে, এখান থেকে আপনাদের মধ্যে কয়েকজন যেতেও হয়তো পারেন।"

—"নাম শুনেছেন?" আমরা প্রশ্ন করিলাম।

—"না, নাম শুনি নি। ওরাও আমাদের মতই আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছে। যদি অর্ডার আসেই তবে আগেই জানতে পাবেন, কথা দিচ্ছি।"

ভরসা দিয়া জেলার-বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আফিসে কি কাজ আছে, যাইতে হইবে, তাই আর বিলম্ব করিলেন না।

'সময় যখন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে'—এই ভাব নিয়া আমরা দিন যাপন করিতে লাগিলাম।

বলিতে লজ্জা নাই, আমোদ-আহ্লাদে গল্পে-গুজবে হৈ-হৈ করিয়া দিনগুলিকে আমরা দুই হাতে উড়াইয়া দিতে লাগিলাম। সময়ের যেন সে-দিন পাখা গজাইয়াছিল। আর আজ? আজ সময় কাটিতেই চায় না, তার পাখাদুটা যেন কেমন করিয়া কাটা পড়িয়াছে। নদী আর কাল-গতি উভয়েই নাকি সমান। তা হইলে বুঝিতে হইবে, পৃথিবীর সমস্ত নদী এতদিনে পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মত মন্থর হইয়াছে, জল নিয়া আর চলিতে পারে না। কিম্বা -সমস্ত নদীর জল শুকাইয়া গিয়াছে, স্রোতও মরিয়া গিয়াছে, মরা-নদীর শুষ্ক বালু-কঙ্কালে গতি আর গতায়াত করে না। আজিকার সময়ের সংগে সাদৃশ্যে থাকিলে নদী-গুলির এছাড়া আর কি বা পরিণতি হইতে পারে, আমি তো বুঝি না।

কিন্তু সাত বছর আগে এমন ছিল না। সময় যেন যুদ্ধের ঘোড়া, ধাইয়া চলিয়াছে--ক্ষুর ঘর্ষণে ঋতু-আবর্তিত হইতেছে, আকাশে গ্রহ-উপগ্রহ পরস্পরকে ঘিরিয়া নাচিয়া গাইয়া চলিয়াছে। সময়ের ঘোড়াকে সে-দিন কে যেন কঠিন চাবুক মারিয়া ক্ষেপাইয়া লইয়া উন্মত্তের মত ছুটাইয়াছিলেন। আমাদেরও সে-নেশা লাগিয়াছিল। আমরা দুই হাতে দিন-রাত্রি আকাশে উড়াইয়া দিতাম।

সিউড়ী-জেলে আমরা ছিলাম চৌদ্দজন। আর অন্য দিকে সত্যাগ্রহীর সংখ্যা ছিল শ'কয়েক। মেলা-মেশা আইনে নিষেধ ছিল, কিন্তু কার্যে নিষেধ ছিল না। কারণ, সত্যাগ্রহীরা এ-নিষেধ মানিয়া চলিত না। আর, আমাদের তো নিষেধ মানিলে কাজ চলে না। ইতিমধ্যে পূজা আসিয়া পড়িল।

কংগ্রেস-নেতা ডাক্তার শরচ্চন্দ্র মুখার্জীর সাহায্যে ও অন্যান্য সকলের উৎসাহে সত্যাগ্রহীরা পূজার আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। পূজার ভোজ খাইলাম এবং সত্যাগ্রহীদের অনুষ্ঠিত থিয়েটার পর্যন্ত দেখিতে পাইলাম।

থিয়েটারের কথা আজ বেশ পরিষ্কার মনে আছে। যে-পিস্তলটি দিয়া গোবিন্দলাল রাত্রে রোহিণীকে গুলি করিয়া মারিয়াছিল, পরের দিন ভোরে বন্ধুবর শচীশ সরকারের হাতে সেই স্মরণীয় বস্তুটি

দেখিতে পাইলাম। জানি না, জিনিসটি তিনি রক্ষা করিয়াছেন কি না। না করিয়া থাকিলে করা উচিৎ ছিল। নানা কারণেই সে-বস্তুটি সযত্নে রক্ষার যোগ্য ছিল।

দেখিলাম, গাছের ছোট্ট একটি বাঁকা ডালই পিস্তলের কাজটা চালাইয়া দিয়াছে। কিন্তু কাজটা অপরের দোষে নিখুঁতভাবে হইতে পারে নাই, বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। কেমন করিয়া, তাহাই বলিতেছি।—

ভয়ানক সময় উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল বুঝিল, রোহিণী পাপিষ্ঠা, পর-পুরুষে আসক্তা। তার জন্য খামোকা ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়াছে, খামোকা অকলঙ্ক-চরিত্রে কালি লাগাইয়াছে—দুঃখে ও কষ্টে গোবিন্দলালের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মানুষের বুক তো, কিছু আর লোহা-পাথরে বানানো নয়। ভিতরে তার যে-উত্তাপ ও জ্বালা, তাতে বুঝি লোহাও গলিয়া যাইত। কান্না ও ক্রোধ-মিশানো গলায় গোবিন্দলাল প্রশ্ন করিল—"তুমি কি-ঈ রোহিণী?"

তারপর ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়াইয়া লইয়া কহিল—"এই দেখ পিস্তল!"

রোহিণী পিস্তল দেখিল। স্পষ্ট বোঝা গেল, দেখিয়াই রোহিণী ভয় পাইয়াছে।

গোবিন্দলাল তেমনি আছে, হাত একটুও বাঁকাইল না, বরাবর টান রাখিয়াই জানিতে চাহিল—"কেমন, মরতে পা-রবে?"

রোহিণী মরিতে পারিবে না, কারণ ভরা-যৌবন, নানা সাধ-আহ্লাদ ইত্যাদি বিস্তর অন্তরায় আছে।...না-না, তার বাঁচা হইবে না। রোহিণী বাঁচিলে অনেক লোকের অসুবিধা হইবে, তাদেরও সাধ-আহ্লাদ তাকে (রোহিণীকে) দেখিয়া জাগিয়া বসিবে, যেমন তার (গোবিন্দলাল) জাগিয়াছিল। না—তার বাঁচা হইবে না, হইতে পারে না, গোবিন্দলাল ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে...উঁহু, এর আর নট্ নড়ন, নট্ চড়ন।

গোবিন্দলাল ডানপা সামনে বাড়াইয়া লইল—পিস্তলশুদ্ধ ডানহাত

কিন্তু তেমনি রোহিণীর মুখের দিকে প্রসারিত আছে। গোবিন্দলাল আজ সত্যই ঘাতক।

রোহিণী কাঁদিয়া ফেলিল। ভঙ্গীভরে উত্তোলিত দুইহাতে মুখের সম্মুখে একটা ভঙ্গুর আচ্ছাদন রচনা করিয়া কহিল—"না না, মেরো না।"

আমরা দম বন্ধ করিয়া রহিলাম। গোবিন্দলালের লাল চক্ষুতে ক্ষমার চিহ্ন পর্যন্ত নাই। গোবিন্দলাল কহিল—"তুমি মর-ও," বলিয়া পিস্তল টিপিয়া দিল।

কিন্তু আওয়াজ হইতেছে না কেন? ক্রুদ্ধ গোবিন্দলাল উয়িংসের দিকে ঘাড় বাঁকা করিয়া চাহিল। পিস্তলের আওয়াজটা বোধ হয় সেখান হইতে আসার কথা, তার কাজ ছিল শুধু পিস্তলটা টিপিয়া দেওয়া। আওয়াজ আসিতেছে না—গোবিন্দলাল পিস্তল বাগাইয়া রাখিল। এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রোহিণী বজ্জাত ঘোড়ার মত খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল, আওয়াজ-না-আসা পর্যন্ত যতটুকু পারে বাঁচিয়া লওয়ার মতলব তার। অবশেষে, যাঁর উপর ভার ছিল, তিনি আওয়াজ ছাড়িলেন। রোহিণী ধপাস্ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল এবং মরিয়া রহিল। পর্দাও ঝপাৎ করিয়া নামিয়া পড়িল।—এতক্ষণে আমরা নিঃশ্বাস মুক্ত করিয়া কুম্ভকের কষ্ট হইতে বাঁচিলাম।

বন্ধুবর শচীশ সরকার দেখি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলাম—"কোথায় যাচ্ছেন? থিয়েটার শেষ হয়নি, আরও বাকী আছে, বসুন।"

"আসছি"—বলিয়া তিনি গ্রীণ-রুমের দিকে চলিয়া গেলেন। থিয়েটার শুরু হইতে তিনি এক সময়ে আসিয়া নিঃশব্দে নিজের জায়গায় বসিলেন। কিন্তু কোথায় ও কেন গিয়াছিলেন, তখন আর জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।

ভোরে একটু বেলা করিয়া ঘুম ভাঙ্গিল, থিয়েটার শুনিয়া আসিয়া ঘুমাইতে অনেক রাত হইয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানায় বসিয়া ছিলাম। কয়েদী আসিয়া মশারি তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল। এমন সময়ে শচীশবাবু ঘরে ঢুকিলেন।

আমার নাকের ডগার সামনে কি একটা বস্তু ধরিয়া কহিলেন—“এই দেখুন পিস্তল? কেমন মরতে পা-রবেন?”

--“দেখি, আমার হাতে একটু দিন তো।”

আবেদন গ্রাহ্য হইল না। অন্যান্য সকলের দিকে পিস্তলের মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া শচীশবাবু কহিলেন—“আপনারা অনেক পিস্তল দেখেছেন, কিন্তু এ-রকমটি আর দেখেন নি, আমি জোর করে বলতে পারি। এর কত সুবিধে জানেন? এ-পিস্তল থাকে একজনের হাতে, শব্দ থাকে অপরের মুখে, শুধু মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে “রোহিণী তবে তুমি মর-ও.” সঙ্গে-সঙ্গেই কার্য-সিদ্ধি, না মরে আর রক্ষা নাই। এ-রকম পিস্তল যদি আপনাদের থাকত, তবে এ-দেশের সাহেব সাবাড় করতে একটা মাসও লাগত না। এ-পিস্তল তাই আমি কাল স্বয়ং গিয়ে গ্রীণ-রুম থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছি।”

বাঁকা ডাল-রূপী পিস্তলকে হস্তগত করিবার জন্য অনেকগুলি ঊর্ধ্ব-বাহু দেখা গেল। অবশেষে সেটা সন্তোষ গাঙ্গুলীর দখলে গিয়া পড়িল। সন্তোষবাবু সাহিত্যিক মানুষ ছিলেন, বলিতেও পারিতেন, কহিলেন—“হে পিস্তল, ত্রেতায় তুমি পরশুরামের কুড়ালের আছাড়ি ছিলে, এবার কলিতে গোবিন্দলালের ডালের পিস্তল হইয়াছ। পরশু-রাম কুড়াল দিয়া কোপাইয়া মাকে মারিয়াছিলেন, গোবিন্দলাল তোমাকে দিয়া রোহিণীকে মারিলেন। কিন্তু রোহিণী কে?”

বলিয়া সন্তোষবাবু চারিদিকে জিজ্ঞাসু-চোখ ঘুরাইয়া লইলেন। এবং পরে নিজেই যোগ করিলেন—“রোহিণী কে?

......নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ,
শুধু সুন্দরী রূপসী।”

সিউড়ীর একটি সন্ধ্যার কথা বিশেষ করিয়া আমার মনে আছে।

বেশ মনে পড়ে, সন্ধ্যার পর একটা বাঁধানো ইঁদারার চত্বরের উপর বসিয়া আছি। পৃথিবীতে সন্ধ্যা নামিয়াছে, আকাশে কিন্তু তখনও রং মিলায় নাই। পশ্চিম দিকটার রং ধীরে ধীরে মরিয়া আসিতে দেখিলাম। একটি একটি করিয়া আকাশে তারা আসিল, তাও দেখিলাম। মাথার উপর দিয়া বাদুড় উড়িয়া গেল—বসিয়াই রহিলাম। ক্রমে আকাশ অন্ধকার হইয়া উঠিল, নিচে পৃথিবীতে রাত্র দেখা দিল।

সিউড়ীর রাত্রির আকাশ সেদিন আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শরৎকালের আকাশ পূব-বাংলায়ও পরিষ্কার কম নয়, কিন্তু এ-আকাশের সঙ্গে তুলনাই হয় না। যতদূর দৃষ্টি যাইতেছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আকাশ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। এমন আকাশে জ্বলন্ত তারা মুঠা মুঠা ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দেখিয়া সন্দেহ থাকে না যে, প্রত্যেকটি তারার পিছনে কোন্ এক অদৃশ্য শিল্পীর প্রেম-স্পর্শ রহিয়াছে। প্রিয়-সোহাগিনীকে কে যেন সযত্নে সাজাইয়া লইয়াছে—এখন পরম পরিতৃপ্তির সহিত সারা রাত্র ভরিয়া দেখিবে। এ-আকাশের তুলনা নাই।

বছর দেড়েক দুই পরে আর এক আকাশ দেখিলাম দেউলীতে গিয়া। তাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু এ-কথায় সে-মরুভূমির আকাশের কিছুই বোঝা যায় না। রাজপুতনার আকাশে কোথাও স্নিগ্ধতা নাই, সে-আকাশের সব শ্যামল লাবণ্য আগুনে পোড়াইয়া নিঃশেষে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন, "রাজপুতানীর দেহে কোথাও নাই কি কোমলতা?" কেমন করিয়া থাকিবে? থাকিবার কথাও নহে। এমন নির্মম আকাশের তলে জন্মিয়াছিলেন, তারই আচ্ছাদন তলে দিনে দিনে বাড়িয়াছিলেন, তাই রাণী-পদ্মিনী সহস্র সখী নিয়া জহর-আগুনে স্নান করিতে ঝাঁপ দিতে পারিয়াছিলেন।

সে-আকাশে দয়া নাই, মমতা নাই, চাহিলে চোখ পুড়িয়া যায়। অনন্ত-কাল ধরিয়া ওখানে যেন তপতী সীতার অগ্নি-পরীক্ষা চলিতেছে।

আমার মাথার উপর সিউড়ীর আকাশ বহু পূর্বেই সন্ধ্যার কালো জলে অবগাহন করিয়া দিনের দাহ ধুইয়া ফেলিয়াছিল। স্পর্শ করিবার প্রয়োজন হয় না, সেই শ্যাম-স্নিগ্ধতার দিকে চাহিয়াই চক্ষু জুড়াইয়া যায়, মন তৃপ্তি-রসে আপনার মধ্যে আপনি সঘন হইয়া আসে। সমস্ত মনখানি আকাশের দিকে পেয়ালার মত ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। মনের মধ্যে সেদিন এক অদ্ভুত ভিক্ষুককে দেখিয়াছিলাম, অনন্তের দিকে পিপাসার পাত্র বাড়াইয়া কি পানীয় সে প্রার্থনা করিতেছিল, তাহা বুঝাইব কেমন করিয়া! আজ ভাবি—আমারই মন, অথচ তার কতটুকু পরিচয়ই বা আমি জানি।

মগ্ন হইয়াছিলাম, বিশেষ কিছু ভাবিতেছিলাম, তাও নয়। বরং চিন্তা-স্রোত যেন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল এবং কি এক অপূর্ব-রস মনের অন্ধ্রে-রন্ধ্রে সঞ্চারিত হইতেছিল। ধ্যান-রসের সম্বাদ রাখি না, অথচ এ-যে কি-রস তারও সংজ্ঞা আমার জানা নাই।

এমন সময় আমার নাম ধরিয়া কে ডাকিতেছে, শুনিতে পাইলাম। সজাগ হইয়া চাহিতেই দেখি ঢাকার ঝুমুবাবু (হীরেন মজুমদার) পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অন্ধকারে তাঁর মুখ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু সুরে উত্তেজনার চিহ্ন এবং ভাবে খুব ব্যস্ত-সমস্ত।

কহিলাম—"কি, ব্যাপার কি?"

—"চলুন, তাড়াতাড়ি চলুন। অম্বিকা চক্রবর্তীকে নিয়ে যাচ্ছে।"

—"কাকে নিয়ে যাচ্ছে?" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

চলিতে চলিতে কহিলেন—"চাটগার অম্বিকা চক্রবর্তী—আর্মারী-রেইড কেসের; অবস্থা খুব খারাপ। এই মাত্র এই জেলে নিয়ে এসেছে।"

অম্বিকাবাবুকে আমি চিনিতাম। তাড়াতাড়ি জেল গেটের দিকে দৌড়াইয়া গেলাম। কিছুদূর আগাইতেই দেখি যে, কয়েকটা লণ্ঠন

লইয়া কাহারা থাইসিস ওয়ার্ডের দিকে যাইতেছে। আগাইয়া গেলাম। দুজন বাহক একটি স্ট্রেচার বহিয়া আস্তে আস্তে যাইতেছিল, সঙ্গে গুটিকয়েক সিপাই, জমাদার, ডাক্তার ও জেলারবাবু। আমাদিগকে দেখিয়া জেলার স্ট্রেচার পথের মধ্যে নামাইতে হুকুম দিলেন। দেখিলাম, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলার বিখ্যাত আসামী অম্বিকা চক্রবর্তীর চামড়ায়-ঢাকা দীর্ঘ কঙ্কালখানি মাত্র শায়িত পড়িয়া আছে।

অতি কষ্টে কথা কহিলেন। বলিলেন যে, শরীরের অবস্থা ভালো নয়, সামান্য কাশ দিতেই গলা দিয়া রক্ত বাহির হয়! শেষে একটু হাসিয়া কহিলেন—“শেষকালে এইভাবে মরা—।” কথাটা আর শেষ করেন নাই। আমাকে কহিলেন—“যান যেন।”

বাহকেরা তাঁহাকে লইয়া যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের দিকে চলিয়া গেল। এই জেলের মধ্যেই এক-ধারে দেয়াল দিয়া যক্ষ্মারোগীদের ওয়ার্ড স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে—জেলের মধ্যে আর একটি জেল যেন।

যক্ষ্মারোগীর ওয়ার্ডে সিপাহী, ডাক্তার ও জেল-কর্মচারী ব্যতীত অপরের যাওয়া নিষেধ, উপায়ও নাই—গেটের দরজা বন্ধ করিয়া পাহারা সেখানে মোতায়েন থাকে। তাছাড়া আমরাও খারাপ চরিত্রের বন্দী, আমাদের গতিবিধি জেল-আইনে সীমাবদ্ধ। তবু আমরা সত্যাগ্রহীর আড্ডায় যাইতাম, তাঁরাও আসিতেন। একই জেল, দেয়ালের ব্যবধান ছিল না, তাই যাতায়াত চলিতে পারিত।

কিন্তু গেটে পাহারা, দরজা বন্ধ, তদুপরি দেয়াল দিয়া স্বতন্ত্র করিয়া রাখা থাইসিস্-ওয়ার্ড, সেখানে গিয়া কেমন করিয়া দেখা করিব, ভাবনা হইল। সর্বোপরি, আর্মারী-রেইড মামলার আসামী, পাহারার কড়াকড়ি একটু বেশীই হইবে। ভাবনাটা, কাজেই, একটু হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু কার্য-কালে দেখিলাম, যত ভাবিয়াছিলাম, ততখানি না ভাবিলেও চলিত। সময়-কালে দরজা খোলা পাওয়া গেল। বেলা গোটা নয়-দশের সময় পরদিন অম্বিকাবাবুর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

দেখি, বিছানার উপর বসিয়া আছেন। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিলেন—"বসুন।"

চেয়ার টানিয়া বসিলাম। শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম, সরকার তাঁর বিচার স্থগিত রাখিয়াছেন, যদি সারিয়া সত্যই একদিন উঠেন তখন বিচার করা হইবে। অম্বিকাবাবু নিজে জীবনের আশা রাখেন না। তাঁর ধারণা যে, আয়ু তাঁর প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া আমারও তাই মনে হইল। যদি এ-রোগ ও অবস্থা হইতে সারিয়া উঠেন, তবে সে একটা আশ্চর্যের বিষয় হইবে।

কহিলাম—"জায়গাটা ভালো আর rest-ও পাবেন, দেখবেন ভালো হয়ে উঠছেন।"

শান্তভাবে কহিলেন—"শেষে এই ভাবে রোগে ভুগে শেষ হওয়া! যদি মরতেই হয়, তবে এ-ভাবে নয়। ফাঁসি দিলে তবু একটা সান্ত্বনা থাকত, কিন্তু ভালো না হয়ে উঠ্‌লে সে-সম্ভাবনা কই?"

বুঝিলাম, রোগীর মৃত্যুতে তাঁর ঘৃণা রহিয়াছে. সারা মন দিয়া আজ একটিমাত্র জিনিস তিনি কামনা করিতেছেন—তা বিদ্রোহীর গৌরবজনক মৃত্যু।

কহিলাম—"আমরা খবর পেয়েছিলাম যে আপনি মারা গেছেন।"

হাসিয়া কহিলেন—"আত্মীয়েরাও তাই মনে করে শ্রাদ্ধাদি কাজ সেরে রেখেছেন। সবাই মনে করেছেন যে. আমি মারা গেছি। এ-ভুল সরকারও করেছিল। বাঁচাটা সত্যই একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়েছে। কেমন করে বাঁচলাম তাই ভাবি।"

—"কেন, কি হয়েছিল?"

উত্তরে যাহা বলিলেন এবং শরীরের যে সব চিহ্ন দেখাইলেন, তাতে বিস্মিত হইতে হয় যে, মৃত্যুর হাত তিনি এড়াইলেন কেমন করিয়া। বাঁচাটা মস্ত একটা accident বলিয়াই আমার মনে হইল।

বুকে কালো কালো দাগ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এগুলি কি?"

মুচ্‌কি হাসিয়া কহিলেন—"কালশিটে।"

—"তাতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেমন করে হোল?"

—"বুটের পেরেকে, আর বন্দুকের কুঁদায়।"

চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—"বুঝতে পারলেন না? আচ্ছা বল্‌ছি," বলিয়া হাঁটু ও উরুর কাপড় সরাইয়া দেখাইলেন, কালশিটে সব ছাইয়া আছে।

—"আরও আছে, দেখাতে পারলাম না। ধরা পড়ার পর আক্রোশ মিটাবার জন্য বুট-পায়ে শরীরের উপর দিয়ে প্যারেড্ করেছে, বন্দুকের কুঁদাও ব্যবহৃত হয়েছে।- গলাদিয়ে রক্ত-পড়া সেই থেকেই শুরু হয়েছে।"

—"কারা? ইউরোপীয়ান-অফিসাররা করেছেন?"

—"তাঁরাও ভালো ব্যবহার করেন নি অবশ্য। কিন্তু এ-কীর্তি কয়েকটি দেশী পুলিশ-কর্মচারীর। অনেক সময়ই ভাবি, বাঙ্গালী হয়েও এ-রকম বিজাতীয় আক্রোশ তাঁদের আসে কি করে, তাঁদের এ-মনোবৃত্তির হেতুই বা কি? অজ্ঞান হয়ে গেছি, তবু-বুট-পায়ে সমান বুকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছেন। জঘন্য গালাগালির কথা নয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু এ-ব্যবহার—আমি তো কারণ ভেবে পাই না।"

চুপ করিয়া শুনিতেছিলাম। কিন্তু সে-দিন ভিতরে রক্তে যে জ্বালা বোধ করিয়াছিলাম, আজও তা মনে আছে। রক্তে কামড় লাগে—পোকায় যেন আগুনের বিষ ছড়ায়। মাথায় রক্ত চাপিলে মানুষের যে কি-খুনী চেহারা হয়, তা' কতকটা সেই দিন জানিতে পারিয়াছিলাম।

আজ আর মাথায় রক্ত উঠে না, রাগও হয় না, লজ্জা একটু হয়, তাও সাময়িক। স্বজাতীয়ের অধঃপতন ও চরিত্রহীনতায় লজ্জিত হই বটে—কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য সে-লজ্জা মনে থাকে না। শুধু মনে ভাবনা গভীর হয় যে, আর কত নীচে নামিতে হইবে! যত ক্ষুদ্র ও হীন হওয়ার, তাকি আমরা আজও হইতে পারি নাই? আর কত নামিব—উপরে উঠিবার আহ্বান-আসার সময় কবে আসিবে? মানুষের নিম্নতম পতনতো দীর্ঘদিনই দেখিলাম। মানুষের উচ্চতা কত উর্দ্ধে

উঠিতে পারে, এবার তার জন্য ডাক কি শুনিতে পাইব না? পাইলে, সে কবে?

রাত্রে বিছানায় শুইয়া সে-দিন কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। অম্বিকাবাবুর নিকট যে-সব কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাই রাত্রি-বেলা একাকী পাইয়া মনের সামনে মূর্তি ধরিয়া বার বার দেখা দিতে লাগিল।—

নিশীথ-রাত্রে অতর্কিতে অস্ত্রাগার-আক্রমণ ও লুণ্ঠন—চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেই চোখের সামনে সে-ইতিহাসের পুনরাভিনয় হইতে দেখি। 'কাদের মশালে আকাশের ভালে আগুন উঠেছে ফুটে' অন্ধকার আকাশে আগুন ধরানো হইয়াছে—চোখের সামনে এ-ছবি নিয়া ঘুমাইতে পারার মত নার্ভ সে-দিন আমার ছিল না।

আজ প্রশ্ন মনে আসিতেছে—আকাশের সে-আগুন নিভানো হইয়াছে কিনা? কিম্বা, সে-আগুন ধীরে ধীরে সারা আকাশটা গ্রাস করিবে? রঞ্জিৎ সিং নাকি বলিয়াছিলেন—"সব লাল হো যায়গা।" ইতিহাসের কি সত্যই পুনরাবৃত্তি হয়?—

অম্বিকাবাবুর মুখে সে-দিনের শোনা দুটি সামান্য খবর এখানে উল্লেখ করিব।—

সহরের অবস্থা এখন শান্ত হইয়াছে, সমুদ্রে জাহাজ-বাস ত্যাগ করিয়া সাহেবদের পরিবারবর্গ সহরে আসিয়া আগের মত বসবাস করিতেছেন। সাহেবদের ছেলে-মেয়েরাও কাঁদে,—জানি না কোন দুঃখে, এমনি এক ক্রন্দন-রত শিশুকে তার মা বা আয়া কিছুতেই শান্ত করিতে পারিতেছিল না। সমস্ত উপায় ব্যর্থ হইলে এক বুড়ী মেম ছেলেটির কাছে আসিয়া ভারী গলায় কহিল—"Hush up Baby. Sing is coming."

সিং মানে অনন্ত সিং। বেবি তৎক্ষণাৎ শান্ত হইয়াছিল। সিংয়ের নামে সাহেবদের দুষ্ট ছেলে-মেয়েরা শান্ত হইত।

আমরাও একদিন 'বর্গী এল দেশে' শুনিয়া ঘুমাইতাম এবং পাড়া

জুড়াইত। আচ্ছা, এমন কি কখনও সম্ভব হইতে পারে না যে, বৌবিই শুধু ঘুমাইবে না, এ-দেশের নামে তার বয়স্ক বাবা মারাও শান্ত হইবে, এ-পাড়াটা সত্যই জুড়াইবে! আজ যা স্বপ্ন বলিয়া লাগে, আগামী-দিনে তাহা আর স্বপ্ন থাকে না, সত্য ও সম্ভব হইয়া দেখা দেয়—মানুষের ইতিহাসে এ-নজীরের তো অভাব নাই। সে ইতিহাসের এ দেশে সত্য হইতে বাধা কি?

কয়েক মাস পরের ব্যাপার।—পলাতক বিপ্লবীদের ধরিবার জন্য সরকার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সারা চট্টগ্রাম সৈন্যদের ছাউনী হইয়াছে। দেশে শান্তি-প্রতিষ্ঠার ধাক্কায় গ্রামে গ্রামে 'ত্রাহি-ত্রাহি' ডাক উঠিয়াছে। বিপ্লবীদের মাথার দাম চড়িয়া গেল—কারু দশ-হাজার, কারু পাঁচ-হাজার, কারু বা হাজার টাকা। যে ঐ-মাথা ধরাইয়া দিতে পারিবে, মাথার উপরে নির্ধারিত তঙ্কা তাহার প্রাপ্য হইবে।

এমন দিনে সন্ধ্যার পর আশ্রয়ের জন্য অম্বিকাবাবু এক গ্রামে আসেন, সঙ্গে দুজন সঙ্গী। শরীর দুর্বল, ক্ষত-চিহ্নগুলি তখনও ভালো করিয়া শুকায় নাই, নিশ্চিত মৃত্যু হইতে কোন রকমে বাঁচিয়া উঠিয়াছেন—শ্রান্ত হইয়া এক গৃহস্থের ঘরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পরে গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হইবেন—ঘরের বেড়া ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঘরের মধ্যে মেয়েছেলের গলা শোনা যাইতেছিল। মনোযোগ করিতেই বুঝিতে পারিলেন যে, কে একজন লক্ষ্মীর পুঁথি পড়িতেছে। বিষ্যুৎবার, তাই গৃহস্থ-বধূদের লক্ষ্মীর ব্রত। পুঁথি শেষ হইল। বোধহয় এখন গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম চলিতেছে। এমন সময় কানে আসিল কে একজন প্রার্থনা করিতেছেন—"মা লক্ষ্মী, অনন্ত সিংকে বাঁচিয়ে রাখ, সূর্য সেনকে বাঁচিয়ে রাখ। মা, ওরা কেউ যেন ধরা না পড়ে।"—অম্বিকাবাবুর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের বধূ—ধন-ঐশ্বর্য প্রার্থনা করিল না, অভাব-অভিযোগ জানাইল না, কিম্বা সুখ-শান্তি কোনটাই চাহিল না।

দেবতার নিকট তাদের প্রাণ ভিক্ষা চাহিল, যাদের সে কোনদিন চোখে দেখে নাই, যাদের চেনেনা জানেনা, শুধু যাদের নাম ও কথা মাত্র শুনিয়াছে। তাদের প্রাণের জন্য এর এ মমতা-বোধ কেন?—

অম্বিকাবাবুর ইচ্ছা হইল, ভিতরে গিয়া এদের একবার দেখিয়া আসেন। কিন্তু সে-ইচ্ছা দমন করিলেন। পুলিশের লোকের কানে যদি কোনরকমে এ-খবরটা পেঁছায়, তবে এ-বাটীর অধিবাসীদের দুর্গতির আর অবধি থাকিবে না। সঙ্গী দুজনকে সঙ্গে নিয়া তিনি আবার ধীরে ধীরে অন্ধকারে গ্রামের পথ ধরিলেন।

অবস্থাটা মন্দ নয়—নিজের দেশে রাত্র-অন্ধকারে লুকাইয়া ফিরিতে হয়, হিংস্র শ্বাপদের মত দলে দলে ক্ষুধার্ত বিদেশীরা সানুচর ঘুরিয়া ফিরিতেছে, অতর্কিতে ঘাড়ের উপর যে-কোন মুহূর্তে আসিয়া লাফাইয়া পড়িতে পারে। আর, অন্যদিকে গৃহদেবতার পায়ের তলায় একটি বেদনাতুর ক্রন্দন লুটাইয়া পড়িয়া প্রাণ-ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। তবু গৃহে ফিরিয়া যাওয়া যাইতেছে না, ঐ শ্বাপদবেষ্টিত অন্ধকারেই লুকাইয়া ফিরিতে হইবে।

সিউড়ী-জেলে এক সত্যাগ্রহী ভদ্রলোককে দেখিয়াছিলাম, তাহাকে ভুলিতে পারি নাই। জীবনে যে-কয়টি অদ্ভুত মানুষকে দেখিয়াছি—এই ভদ্রলোক তাহাদের একজন।

আমরা যাহারা সাধারণ মানুষ, তাহারা যেন ঝাঁকের মাছ। একের সঙ্গে অপরের তেমন কোন পার্থক্য থাকে না, একটিকে ধরিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেই বাদ-বাকী সমস্তকেই চেনা ও জানা হইয়া যায়। এই ভীড়ের মধ্যে যাহারা একটু স্বতন্ত্র বিশেষ, তাহারাই মনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। তখন মনে হয়, এই পুরানো পৃথিবীতে যেন নূতন কিছু দেখিলাম। পুরানো যত প্রয়োজনীয়ই হউক, অথবা যত গুণই তার থাকুক না কেন, মন কিন্তু কম্পাসের কাঁটার মত সেই অলব্ধ-নূতনের দিকেই অহরহ ঝুঁকিয়া থাকে; নূতনের সাক্ষাৎ পাইলে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া রহে, যতদিন না সে-নূতন ব্যবহারে ও অতি-পরিচয়ে পুরানোর দলে গিয়া পড়ে।

এই ভদ্রলোকের মধ্যে বিশেষ-কিছু আমি দেখিয়াছিলাম এবং তাহাকে নূতন-কিছু বলিয়াই আমার মন গ্রহণ করিয়াছিল। ভদ্রলোককে যে ভুলিতে পারি নাই, সে আমার কৃতিত্ব নয়, তিনি নিজ বৈশিষ্ট্যেই মনে পাকা-পোক্ত জায়গা করিয়া লইয়াছেন।

ভদ্রলোকের নাম আমার মনে নাই, চেহারাটা মনে আছে। শঙ্করাচার্য্য নাকি বলিয়াছেন যে, নাম ও রূপ দুইই মিথ্যা। আমি অতখানি যাইতে সাহস পাই নাই, অর্ধেকটা পর্যন্ত স্বীকার পাইতে পারি—অর্থাৎ নামটা মিথ্যা, এ-কথায় সায় দিতে পারি। জানি না, কোন দর্শন-শাস্ত্রে নাম ও রূপকে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বাঁধা বলিয়া মানা হয় কি না। যদি মানা হয়, তবে তার ঘোরতর প্রতিবাদ এখানে করিয়া রাখা গেল। কথাটা যখন উঠিয়াই পড়িল, তখন আরও কিছুটা কথা যোগ করিতেছি—

নাম ও রূপ অচ্ছেদ্য নয়। অনেক সময় নামটা অতি চেনা লাগে,

কিন্তু মুখ কিছুতেই মনে আসে না। তখন নামটা একটা ফ্রেমের মত শূন্যে ঝুলিতে থাকে, কোন মুখের ছবি সেখানে ফুটিয়া উঠে না—রূপহীন নিঃসঙ্গ-নাম কেবল ভাসিয়া চলে, কোন রূপের কিনারায় গিয়া ঠেকে না।

আবার এর উল্টাটিও হয়—যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে। মুখগুলি মনের সামনে পরিষ্কার আসিয়া গিয়াছে, কিন্তু আসিবার কালে যুক্তি করিয়া নামগুলিকে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। চেনা-মুখ জানা-মুখ—কিন্তু, কিছুতেই-তো নাম মনে আসিতে চায় না। তখন খোঁজাখুঁজি পড়িয়া যায়, স্মৃতির রাস্তায় মন ছুটিয়া চলে, কোথায় পথের ধারে নামটা পড়িয়া আছে তুলিয়া আনিবার জন্য। কিন্তু বৃথা খোঁজা, যাহা নাই তাহা নাই। নামহীন-রূপ নগ্ন বিবসন মূর্তি নিয়া দাঁড়াইয়া থাকে—যেন বৃন্তহীন পুষ্প চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মানুষের মন, কখনও নাম ফেলিয়া দিয়া মুখটা মনে রাখে; আবার কখনও নামটা শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে, মুখটা পিছলাইয়া কোথায় অলক্ষ্যে সরিয়া পড়ে। মোটকথা, মানুষ মনেও যেমন রাখে, আবার ভোলেও তেমনি। কাজেই, অর্ধেক-মনে-রাখা ও অর্ধেক-ভোলা জিনিসে মিলাইয়া সে একটা অর্ধ-নারীশ্বর গোছের কিছু সৃষ্টি করিয়া লয়। এর পরেও যিনি বলিবেন যে, নাম ও রূপ অচ্ছেদ্য, তিনি আস্ত একটি কুতার্কিক।

এই ভদ্রলোকের একটিমাত্র পরিচয় আমি জানি—তিনি সত্যাগ্রহ করিয়া জেলে আসিয়াছেন। বাহিরে তিনি কি করিতেন, সে খবর আমি রাখি না। তিনি উকীল হইতে পারেন, ডাক্তার হইতে পারেন, স্কুল-মাস্টার হইতে পারেন, ব্যবসাদারও হইতে পারেন—সংক্ষেপে, তিনি সব কিছুই হইতে পারেন, কিম্বা আদতে কিছু নাও হইতে পারেন। হয়তো-বা কর্মহীন ও উদ্দেশ্য-শূন্য জীবন কাটাইতেছিলেন, হাতের ধারে দেশ স্বাধীন-করার কাজটা পাইয়া ঝোঁকের মাথায় গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

প্রথমদিনে ভদ্রলোককে যে-ভাবে দেখি, তাতে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে লোভ হয় যে—সে যেন একটি আবির্ভাব।

ভোরের টিফিন-পর্ব শেষ হইয়াছে, যে যাহার দিনের কাজে সবেমাত্র মন নিবেশ করিয়াছে। রুমের মধ্যস্থানে টেবিলের উপর ক্যারম-বোর্ড রাখিয়া ধনেশ ভট্টাচার্য ও কেষ্ট চক্রবর্তী দুই পাশে দাঁড়াইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পাশে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছিলাম। ধনেশবাবু মারাত্মক খেলোয়াড়, হাতে 'ষ্ট্রাইকার' গেলে সব গুটি গর্তে নিয়া তবে থামেন। কেষ্টবাবু খেলার সঙ্গে সঙ্গে গানও গাহিতেছিলেন—'আমারে ডাক দিলে হায় (এইখানে ঝোঁক দিতে হইবে) চোখ-ইসারায় (২য় ঝোঁক) কে গো দরদী (৩য় ঝোঁক)।' ওস্তাদ গাইয়ে সুরের বিস্তার করে, কেষ্টবাবুও কথার বিস্তার গাহিয়া দেখাইয়াছিলেন—'হে দরদী, তুমি কেগো, তোমার দরদে যে সন্দেহ হয়। ডাক দিলে, তা ভালোই করেছ, কিন্তু সোজাসুজি ডাকলে না কেন? চোখ ইসারায় ডাক দিলে—উহুঁ, তোমার মতলবতো মোটেই ভালো না, তোমার স্বভাব-চরিত্তিরও কি তবে ভালো না, ওগো দরদী-ঈ-ঈ-ঈ—।'

মুগ্ধ হইয়া ধনেশ ভট্টাচার্যের খেলা ও কেষ্ট চক্রবর্তীর সংগীত দেখিতে ও শুনিতেছিলাম। কেষ্টবাবুর হুঁস ছিল না যে, তাঁহার নূতন-চালের গান শুনিয়া ওপাশের 'সীটে' মাখনবাবু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্য করিতেছেন।

এমন সময় কানে আসিল—"May I come in?"

দরজার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিতেই দেখিলাম—এক মূর্তি। জাইঙ্গা-পরা গোলগাল খাটো এক ভদ্রলোক একগাল দাড়ি লইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া প্রবেশের অনুমতি চাহিতেছেন।

আমরা কিছু বলিবার আগে তিনি নিজেই অনুমতি দিলেন—"Oh yes come in"—বলিয়া 'রাইট্-লেফ্ট্-রাইট্'-মার্চের তালে পা ফেলিয়া ঘরে আসিয়া টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতে লাগিলেন।

ভদ্রলোককে ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ মিলিল। খালি গা, গোলগাল চেহারা, লোমে সর্ব-শরীর আবৃত, দেখিয়াই মন ডাক ছাড়িয়া উঠে--'বাবা, এ যে দেখ্‌ছি আমাদের সেই লোমশ-মুনি—আধুনিক ভাষায় লালিম্লি-কম্বল।' গলায় পৈতা ঝুলিতেছে, হুঁকা দিবার সময় আর কষ্ট করিয়া জাত জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না। চোখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তা আয়তনে ক্ষুদ্র ভ্রূ আর একটু ঝুলিয়া নামিয়া আসিলেই চোখ দু'টাকে ঢাকিতে পারিত। একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া অবাক হইয়া গেলাম যে, চোখে তাঁহার পলক পড়ে না, পড়িলেও অতি কম। এ-রকম স্থির দৃষ্টি স্বাভাবিক মানুষের থাকে না।

ভদ্রলোককে আসিতে দেখিয়া কেষ্ট চক্রবর্তী তাহার সঙ্গীত থামাইয়া কহিলেন--"আসুন।"

তিনি উত্তর করিলেন—"এসেছি। কি ছাই খেলেন! গর্তেই যদি নিতে হয়, এত হাঙ্গামার দরকার কি? হাত দিয়ে ওগুলোকে জড় করে গর্তে ঠেলে দেন না কেন?"

তারপর আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বুঝি সেদিন এলেন?"

মাথা নাড়িয়া সায় দিলাম।

কেষ্টবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন আপনারা মোটমাট ক'জন হলেন?"

"চোদ্দজন।"

--"চোদ্দ? বেশ—একের পিঠে চার চোদ্দ—সোনার কোট ভরে ওঠ।"

আমরা হাসিয়া ফেলিলাম। তিনি কিন্তু হাসিলেন না, ধীরে ধীরে মাখনবাবুর সাঁটে গিয়া বসিলেন।

প্রথম দিনেই ভাব-ভঙ্গী ও কথা-বার্তা শুনিয়া আমার সন্দেহ হইল যে, ভদ্রলোকের মাথায় ছিট্‌ আছে।

এর কিছুদিন পরের ব্যাপার।—

জেলখানাতে আমাদের সপ্তাহে সাতটাই রবিবার। দিনকে টানিয়া রাত্র দেড়টা-দু'টা পর্যন্ত লম্বা করিয়া লইয়া আমরা জাগিতে পারিতাম, আবার রাত্রিকেও ঘুমে ঘুমে দিনের অনেক খানি পর্যন্ত আগাইয়া আনিতেও পারিতাম। আমাদের দিন-রাত্রির বিভাগ আর দশজনের মত ছিল না।

সে দিন বেলা হইয়া গেলেও বিছানা ছাড়িয়া উঠি নাই। মশারির মধ্যে থাকিয়াই দিনের অগ্র-গতি ও উন্নতির আভাষ পাইতেছিলাম। টিফিন্ সমাধা করিয়া চায়ের পেয়ালা ঠুন্‌ঠুন্ বাজাইয়া বাবুরা শেষ করিয়াছেন—তাও তন্দ্রার মধ্যেই এক ফাঁকে চেতনায় জানা হইয়া গিয়াছিল। ধনেশ ভট্টাচার্য ও তাঁর প্রতিপক্ষ কেষ্ট চক্রবর্তী ক্যারম-যুদ্ধে নামিয়াছেন—ঠকাঠক শব্দে তা প্রচারিত হইতেছিল।*ও-কোণার ধারে বাক-যুদ্ধ চলিতেছিল, যোদ্ধা শচীশ সরকার ও সন্তোষ গাঙ্গুলী। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি শব্দ মাঝে মাঝে যুদ্ধের আসর হইতে এদিকেও ছিট্‌কাইয়া আসিয়া পড়িতেছিল। বুঝিলাম, সাহিত্য নিয়া এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম বাধিয়াছে। আমার পাশের খাটে নারায়ণ চক্রবর্তী গুণ্‌গুণ্ করিয়া গান গাহিতেছেন—তন্দ্রাচ্ছন্ন মনের উপর যেন কোথা হইতে টুপ্-টাপ্ করিয়া শিশিরে-ভেজা শিউলীফুল আলগোছে আসিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। বিপরীত দিকের খাটে ম্যানেজার জুমু মজুমদার বাজারের খাতা লিখিতেছেন, তাঁর গলা শোনা যাইতেছে—"কারু কিছু আনতে হবে নাকি, খাতা কিন্তু চলে গেল।"

—"এক বাক্‌স বর্মা-চুরুট লিখে দিন।" কোথা হইতে এ-অনুরোধ বাতাসে উড়িতে উড়িতে এ-ধারে আসিয়া ঝরা-পালকের মত নামিয়া পড়িল।

চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিলাম। সমস্ত ঘরটার শূন্য ভরিয়া নানারকম শব্দ, কথা-বার্তা যাতায়াত করিতেছিল। তাদের ছায়া আমার মনের তন্দ্রার পাতলা পর্দার উপর আঁকা-বাঁকা রেখাপাত করিতেছিল। শূন্যপথে যেন নানা পোশাকের অসংখ্য শব্দের মিছিল চলিয়াছে—

আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগা চেতনা লইয়া বিছানায় তেমনি পড়িয়া রহিলাম।

হঠাৎ সমস্ত চুপ হইয়া গেল—কে যেন সুইচ্ টিপিয়া দিয়াছে, তাই শব্দ নিবিয়া গিয়াছে। মনে হইল, ঘরের মধ্যে যেন একটা আকস্মিক নীরবতা আসিয়া ঢুকিয়াছে। মনের উপর হইতে হেঁচ্কা-টানে তন্দ্রার পাতলা চাদরটা সরিয়া গেল।

ব্যাপারটা কি বুঝিবার জন্য চোখ মেলিবার আগেই অপরিচিত গলা শুনিতে পাইলাম—'জাগো, মুসাফির।'—

চোখ মেলিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে একদল সত্যাগ্রহী। আরও একদল দরজার কাছে আসিয়াছেন, এখনও ভিতরে ঢুকিতে পারেন নাই, তবে ঢুকিলেন বলিয়া।

আর এ-দিকে আমার খাটের সামনেই ঘরের মধ্যে সেই ভদ্রলোক। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, মশারিটা তুলিয়া চাঁদোয়া করিয়া রাখিলাম। কাণ্ড দেখিয়া দু'চোখ আমার বিস্ময়ে যেন হাঁ করিয়া রহিল—ভদ্রলোক নৃত্য-সম্বলিত গান গাহিতেছেন!

তিনি জেলের একখানি কম্বল বাউলের আলখাল্লার মত করিয়া পরিধান করিয়াছেন। ব্রুকবণ্ড-চায়ের বড় একটা কৌটা কিছু বাখারি ও তারের সংযোগে বাউলের একতারা হইয়াছে, সেটাকে একহাতে উঁচু করিয়া ধরিয়া নাচিয়া নাচিয়া এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান গাহিতেছেন। পোশাক-পরিচ্ছদ যেমন অপূর্ব, একবার এ-পা আবার ও-পা তুলিয়া নৃত্যও তেমনি অনবদ্য। সাজ-পোশাকে কোন খুঁত ধরিবার ছিল না। এর সঙ্গে কর্কশ মোটা গলায় গান, তারও সৌন্দর্যের অবধি ছিল না, স্বর্গীয় বলিলেই চলে। গানের পদ আজ আর মনে নাই, কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের ভাবটুকু মনে আছে।

তিনি গাহিতেছিলেন—

'হে মুসাফির আর কত ঘুমাইবে? এখন জাগো। অনেক দূর যে যাইতে হইবে, সে-খেয়াল নাই নাকি? নেও, উঠ—আর দেরী করিও না, জাগিয়া পড়, গাঁঠরী বাঁধ এবং পথে নাম, হে মুসাফির।'

ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়াই আছি—গানও থামিতেছে না, ঊর্ধ্ব-বাহু নৃত্যেও বিরাম হইতেছে না, গান ও নাচ দুইই সমান চলিয়াছে।

এক সময়ে তিনি গান গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গেলেন এবং সত্যাগ্রহীর দলও অধিকাংশই তাঁর পিছনে গেল।

শিক্ষিত ও বয়স্ক ভদ্রলোকের এই কাণ্ড দেখিয়া আজও আবার মনে হইল যে, নিশ্চয় এ পাগল, কিম্বা এর মাথায় ছিট্ আছে।

কিন্তু স্বীকার পাইতে হইল যে, ইনি একাই সত্যাগ্রহীর আসর মাতাইয়া রাখিয়াছেন, জেলের কষ্ট মনে বোঝা হইয়া জমিতে দিতেছেন না এবং হাসি ও আনন্দের হাওয়ায় একাই সব-মনের মেঘ উড়াইয়া খেদাইয়া ফিরিতেছেন। ইনি পাগল হউন ক্ষতি নাই, কিন্তু জেল-জীবনে সঙ্গী ও সাথী-হিসাবে এর দাম পরিমাপ হয় না!

ভদ্রলোকের এ-জাতীয় বিচিত্র আনন্দ-আক্রমণ প্রায়ই হইত। তিনি আসিলেই আমরা তৈরি হইয়া উঠিতাম, মনের অঞ্জলি পাতিয়া অপেক্ষা করিতাম, না জানি কোন নূতন রসের পানীয় পরিবেশন চলিবে। ভদ্রলোক আমাদিগকে লোভী বানাইয়া তুলিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরের ব্যাপার।—

দুপুরে দিবা-নিদ্রা উপভোগ করিয়া লইয়াছি। টিফিনও শেষ করিয়াছি। হাতে আর তখন জরুরী অবশ্য-কর্তব্য কিছু ছিল না। জট্‌লা করিয়া লোহার খাটে বসিয়া নানা কথা-বার্তায় আমরা ব্যাপৃত ছিলাম। দু'মিনিট দাঁড়াইয়া শুনিলে চমক লাগিয়া যাইবে যে এক আসরে কত হরেক-রকমের আলোচনা চলিতে পারে। এমন বিষয় ছিল না, যা নিয়া আমরা দু'কথা না-কহিতে পারিতাম। কোন কিছু না-জানার মস্ত সুবিধাই এই যে, সব-কিছু নিয়াই দ্বিধাহীন আলোচনা ও মন্তব্য করা যাইতে পারে। নতুবা, আমরা পাতঞ্জল-দর্শন নিয়াও গম্ভীর আলোচনা করিতে পারিয়াছিলাম, কে বিশ্বাস করিবে। অবশ্য প্রকারান্তরে একথা বলি না যে, আমরা সর্বশাস্ত্র-পারঙ্গম হইয়া-ছিলাম। আর বলিলে কে-ই বা বিশ্বাস করিবে—দেশ যে নাস্তিকে ভরা।

আলোচনা হইতেছিল যে, মরিলে প্রাণ থাকে কিনা। বিষয়টা অতীব দুরূহ, তাই মীমাংসা হইতেছিল না। কেষ্টবাবু কহিতে চাহিতেছিলেন—"মরার পর আবার মানুষ থাকে কেমন করে? তবে মরার কি অর্থ হয়? মরলেই তো সব শেষ।"

সন্তোষবাবু কহিলেন—"না, সব শেষ নয়। মরার পর অনেকে ভূত হয়ে টিকে থাকে।"

কেষ্টবাবু চটিয়া গেলেন—"আপনি ভূত দেখেছেন যে ভূতের কথা বলছেন?"

—"দেখেছি কি, আলাপ পর্যন্ত করছি।"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম।

কেষ্ট চক্রবর্তী হটিবার পাত্র নহেন, তপ্ত হইয়া কহিলেন—"আপনি একটি অদ্ভুত, আপনি কিম্ভূত।"

তত্ত্ব আলোচনা হাতা-হাতিতে গিয়া না দাঁড়ায়, আমরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু দৈব আমাদের রক্ষা করিলেন।

দেখিলাম, আমাদের আসরের সামনে ঘোমটা মাথায় কে দাঁড়াইয়া। এ মূর্তি কি আর ভুল হইবার। আজ আর ভদ্রলোক একপাল সত্যাগ্রহীকে 'ফলো-মি' বলিয়া পিছনে টানিয়া আনেন নাই, একাই আসিয়া ঢুকিয়াছেন।

পরিধানে জেলের জাইঙ্গা, অথচ একটা চাদরে মাথায় ঘোমটা দিয়া আসিয়াছেন। ব্যাপারটা আমরা সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, তাই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

এমন সময় মেয়েলী-কণ্ঠে হুকুম আসিল—"দুর্গের দরজা বন্ধ কর।"

বুঝিলাম, দাড়ি-গোঁফ যা দেখিতেছি, তা সব মিথ্যা—ঐ-ঘোমটাই খাঁটি। তা নয় বুঝিলাম, কিন্তু কে এই বীর্যময়ী ঈষৎ অবগুণ্ঠিতা রমণী! এবং কোন্ দুর্গের দরজাই বা বন্ধ করিতে হুকুম দিলেন!—চিন্তা নিয়া আমরা শূন্যে ঝুলিতে লাগিলাম।

আবার সেই কণ্ঠ শোনা গেল—"কে? মহারাজ যশোবন্ত সিংহ

আসিয়াছেন? না—মিথ্যা কথা। এ মহারাজা যশোবন্ত সিংহ নন। আমার স্বামী হয় যুদ্ধে মরেন, নয় যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যিনি আসিয়াছেন, তিনি মহারাজা যশোবন্ত সিংহ নন। যাও, দরজা বন্ধ কর।”

হতভাগ্য যশোবন্ত সিংহ, তোমার জন্য দুঃখ হয়। তুমি সিংহীর থাবার তলে পড়িয়াছ দেখিতেছি।

ঘোমটা নামিয়া গেল, দেখা দিলেন যশোবন্ত সিংহ। পুরুষের গলা শোনা গেল; কত অনুনয় করিলেন, কাঁদ কাঁদ হইয়া প্রায় পায়ে ধরিলেন। কিন্তু মহামায়া পাষাণী, স্বামী বলিয়া স্বীকার পাইবেন না. কিম্বা দুর্গেও ঢুকিতে দিবেন না।

মহারাজা যশোবন্ত সিংহ শেষটা খেপিয়া গেলেন। শত হউক, পুরুষ মানুষ তো! নিজের স্ত্রীর এ-ব্যবহার! কাহাতক আর সহ্য করা যায়। ক্ষত্রিয়-রক্ত টগ্-বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। কাল্পনিক-তরোয়ালের মুঠাটাকে শক্ত আঙ্গুলে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—“বেশ. তবে তাই হউক। আমি চলিলাম। হয় যুদ্ধ করিয়া ফিরিব, নয়, এই শেষ।”

বলিয়াই সামরিক কায়দায় আবর্তন এবং দীর্ঘ ও দৃঢ় পদক্ষেপে নিষ্ক্রমণ। ঘোম্‌টা তুলিয়া লইয়া মহামায়া ফিরিয়া আসিয়া পূর্বস্থানে একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কি মেয়েমানুষ, বাবা! এর চেয়ে পাথরও যে নরম। নিজের একমাত্র স্বামী, এত কাঁদাকাটি. এত অনুনয়-বিনয়, চোখের জল—কিছুতেই এ মেয়েমানুষকে কায়দা করা গেল না. কাহিল বা নরম হইবার ধাতুই নয়। আবদার ধরিলেন—যুদ্ধে যদি জয় না হয়, তবে সেখানে গিয়া মরিতে হইবে। স্ত্রীর কাছে হয় যুদ্ধ-জয় করিয়া ফিরিতে হইবে, নয় যুদ্ধে মরিয়া ফিরিতে হইবে। তবেই স্ত্রী পুরুষ ও স্বামী বলিয়া স্বীকার পাইবেন। ধন্য তুমি বীর্যময়ী ক্ষত্রিয়-ললনা! তুমি আদতেই একটি আস্ত সিংহী।

হঠাৎ আর এক সিংহীর কথা মনে পড়িল। এই ক্ষেত্রেই তিনি

হাজার বছর আগে লীলা করিয়া গিয়াছেন, তিনিও ক্ষত্রিয়-কন্যা ছিলেন। বনের মধ্যে পাঁচ স্বামীর সম্মুখে বসিয়া থাবাতে. মানে জিভে বিষ ছড়াইতেছেন। ভীমকে চাঙ্গা করিতে পুরা একটা থাবার আঁচড়ও দরকার হইল না। যত বিপদ ঐ বড় স্বামীটিকে নিয়া। তিনি কিছুতেই উত্তেজিত হইবেন না, এমনই তাঁর ধনুক-ভাঙ্গা জেদ। যুধিষ্ঠিরের শরীরে বোধ হয় বেলেমাছের রক্ত—নইলে সে-দিন সে-ক্ষত্রিয় মেয়েটির মুখ দিয়া যে-সব কথা বাহির হইয়াছিল, তাতে মানুষের রক্ত হইলে জ্বলিয়া উঠিত।

কোন-রকমেই যখন বড়-কর্তাকে কাবু করা গেলনা, তখন স্ত্রীটি মোক্ষম অস্ত্র ছাড়িলেন, মানে কান্না জুড়িয়া দিলেন। বিনাইয়া বিনাইয়া সে কী কান্না, আর বক্তব্য ও ভাষারই বা কী গাঁথুনী।—একটা নয়, পাঁচ-পাঁচটা স্বামী উপস্থিত, রাজার মেয়ে. রাজার বৌ, তাকে প্রকাশ্য রাজ-সভায় বিবস্ত্রা করিয়া অপমান করিল, চোখ মেলিয়া দেখিয়াও যারা প্রতিবাদ করিল না, তাদের হাতেই পিতা তাকে দিয়াছেন, অদৃষ্টের এ-দুঃখ, ভগবান যদি ডাকিয়া না নেন, তবে যে আর সহ্য হয়না, এখন মরণই ভালো—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু যুধিষ্ঠির কম নাছোড়বান্দা নন। ভীম তো দাঁত কড়মড় শুরু করিয়া দিয়াছে। গরম নিশ্বাস ঘন ঘন বাহির হইতেছে—যেন ক্রুদ্ধ সাপ ফুঁসিতেছে। আর যুধিষ্ঠির, সেই সে হাঁটুর উপর পা তুলিয়া লইয়া যুৎ হইয়া বসিয়াছেন, কথাটি পর্যন্ত বলিতেছেন না। তিনি যেন বড় মজা দেখিতেছেন, এমনই ভাবে চাহিয়া আছেন।

হঠাৎ কান্না শুনিতে পাইলাম। এ্যাঁ—যুধিষ্ঠিরও কাঁদে নাকি? ওঃ-না, আমাদের সামনে দাঁড়ানো মহামায়া ঘোমটার তলে কাঁদিতেছেন। তবে এ-দিকের সিংহীও নরম হইয়া আসিয়াছেন। কাঁদিয়া ভগবানের বিরুদ্ধে তিনি নালিশ করিয়াছেন—এত সৌভাগ্য যদি দিতে পারিলে, তবে সুখ দিলেনা কেন? কেন ক্ষত্রিয়-কন্যা করিয়া কঠিন পরীক্ষায় ফেলিলে? ইত্যাদি।

কথাটা মনে হইতেই শিহরিয়া উঠিলাম।—যাক্ ভগবান রক্ষা

করিয়াছেন। নিরীহ-বাঙ্গালীর পরিবারের মধ্যে যদি এ-জাতীয় দু'-একটি সিংহী লেলাইয়া দিতেন—ভাবিতেও বুক শুকাইয়া উঠে। বাঙ্গালীদের উপর ঈশ্বরের দয়া আছে, বুক-ভরা-মধু বঙ্গের বধূরাই থাক, ও-সব ভীষণ সিংহী-ব্যাঘ্রী কি আমাদের পোষায়।

কাঁদিতে কাঁদিতে মহামায়া প্রস্থান করিলেন। ঘোমটা ফেলিয়া খালি গায়ে আমাদের লোমশ মুনি ফিরিয়া আসিলেন।

কহিলেন—"একটু তামাক খান দিকি।"

মাখমবাবু ডাকিয়া কহিলেন—"বসন্ত, তামাক দিয়ে যা।"

বসন্ত পাশে দাঁড়াইয়াই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল, তামাক লইয়া ফিরিয়া আসিল। ভদ্রলোক গড়গড়ার নল মুখে তুলিয়া লইয়া আরাম করিয়া টানিতে লাগিলেন এবং মুখ-ভরা ধোঁয়া চক্ষু অর্ধেক বন্ধ রাখিয়া ছাড়িতে লাগিলেন। চাহিয়া চাহিয়া সেই পুরানো কথাটাই আবার মনে আসিল—ভদ্রলোক পাগল নয় তো?

কিন্তু ভদ্রলোক পাগল ছিলেন না। সিউড়ী ছাড়িয়া আসার কয়েকদিন আগে ভদ্রলোককে ভালো করিয়া জানার সুযোগ হইয়াছিল।

বৈকালের দিকে ইঁদারায় সেই চত্বরের উপর কয়েকজন বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে সেই ভদ্রলোকটি আমাদের ওখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ে সেদিন তাঁর একটা লম্বা কোট ছিল, পরিধানে অবশ্য খাটো জাইঙ্গা। আমাদের দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। বসিতে বলিলাম, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিয়াই কথা-বার্তা কহিতে লাগিলেন।

হাল্‌কা কথা-বার্তা এক সময়ে যে কেমন করিয়া গুরুতর আলোচনায় পরিণত হইল, আমাদের খেয়াল ছিল না! হিংসা ও অহিংসা-নীতি নিয়া দুই পক্ষের কথা কাটা-কাটি চলিতেছিল। বন্ধুদের মধ্যে কে একজন ঠাট্টার সুরে অহিংসাকে আক্রমণ করিলেন। বৈষ্ণব, বৈরাগী, খড়ম-পূজা ইত্যাদি শব্দ মর্ম-পীড়াদায়ক অর্থে ভরিয়া ব্যবহার করিলেন। শুনিয়া এই পাগল ভদ্রলোকের চোখ অন্য-রকম হইয়া গেল।

তারপর তিনি যে-ভাবে কথা-বার্তা কহিলেন, তাতে বিস্মিত হইয়া গেলাম। মনে হইল, তিনি যেন inspired হইয়া গিয়াছেন। তিনি অনেক কথাই বলিয়াছিলেন, সে-বক্তব্যের সমস্ত মনে নাই, কিছুটা মনে আছে। আর মনে আছে তাঁর দ্বিধা-হীন কুণ্ঠা-শূন্য বলার ভঙ্গীটি।

তিনি বলিয়াছিলেন, যে-কথা বহুবার বহু মানুষে বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, যে—মানুষের মধ্যে প্রাণই সবটুকু নয়। যে বাঁচে, সেই প্রাণ-ধর্মী পশুই একমাত্র নয়। তার মধ্যে আর একটা ভিন্ন-ধর্মী অংশ বা অস্তিত্ব আছে, যা জীব-জগতে তার অন্যান্য শরীকের নাই। সে হইল মানুষের অমর অস্তিত্ব—যেখানে তার সত্য-সন্ধান, সত্য-উপলব্ধি, সৌন্দর্য ও মূল্য-বোধ, ন্যায় ও ধর্ম-বুদ্ধি। যখনই পশুর স্বভাবকে সে একমাত্র সম্বল ও আশ্রয় বলিয়া মানিয়াছে, তখনই তার মহৎ সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। অতীতের সভ্যতা এই পশুর পথ ধরিয়াই রহিয়াছে। বিজ্ঞান আজ মানুষের হাতে দেবতার অসীম শক্তি ও অস্ত্র দিয়াছে, কিন্তু দেবত্ব দিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের সে-শক্তি মানুষের ভিতরকার পশুটার হাতে পড়িয়াছে, সে-ই তা ব্যবহার করিতেছে। বর্তমান সভ্যতাও তার অগ্রগামীদের পথ ধরিয়া সর্বনাশের সামনে আসিয়াছে, একই পরিণামে গিয়া তাকে শেষ হইতে হইবে, যদি না সে মানুষের সত্য-অর্থ জীবনে স্বীকার পায় এবং সামাজিক জীবনে তা কার্যকরী করিতে চেষ্টা করে। এই অবস্থার মধ্যেও মানুষের ভিতর মহা-মানব আসেন, তাঁরা হতাশ হন না, ভরসা হারান না। প্রতিকূল অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে মানুষকে মানুষের পথ তাঁরা দেখান, সে-দিকে চালিত করেন। সে-পথ এই অহিংসার পথ, প্রেমের পথ—ভিতরে যে-অন্তর্যামী পুরুষ আছেন, তার পথ। গান্ধী বুদ্ধ ও যীশুরই নূতন মূর্তি এ বিংশ-শতাব্দীতে। ইত্যাদির পরে কহিলেন—"যে-মানুষ একাকী নিজের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে, নিজেকে নিজের মধ্যে খোঁজ করেছে, সেই জানে যে, গভীরে নেমে গেলে কেন প্রেম-করুণার উৎসের মুখ খুলে

যায়, মানুষের সঙ্গে কেন তখন অন্য ব্যবহার মিথ্যা ও অসম্ভব বলে বোধ হয়।”

হিংসা ও অহিংসার মীমাংসা এই এক আসরেই শেষ হইবার নয়, এ আমি জানিতাম। এও জানিতাম যে, দুই পক্ষেরই যথেষ্ট বলিবার আছে। হিংসারও একটা ‘ফিলজফি’ আছে এবং সে যে অহিংসার চাইতে কম জোরালো তা নয়। মানুষের খাঁটি টেকসই পরিচয় কি, কোন নীতিতে নির্ভর করিলে সমস্ত সমস্যার সহজ সমাধান হয়, এ নিয়া অতীতে বহু মনীষী চিন্তা করিয়াছেন, বর্তমানেও করিতেছেন। মানুষের জীবন-আকাশে অনন্ত জিজ্ঞাসার মতই এ-প্রশ্ন-জ্বলিতেছে।—বৈকালের এই এক বৈঠকে সে-প্রশ্নের উত্তর আমি প্রত্যাশা করি নাই।

আরও একটা কথা, এই জাতীয় আলোচনার কালে আমি মনে রাখিতে চেষ্টা করি যে, সকল বস্তুকেই তার ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে সরাইয়া একটা বড় পটভূমিকায় নিয়া দেখা দরকার, নতুবা বস্তুর স্বরূপ বোঝা যায় না। দেখার এ-কৌশল আয়ত্তে না থাকিলে কথা শুধু কথাই থাকিয়া যায়, অনন্তকাল ধরিয়া চেষ্টা করিলেও তা পণ্ড-শ্রমের বেশী কিছু হয়না।

ঘটনা ও বস্তুর পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন হইতে অনন্তকালের ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনায়াসে যাতায়াতের গোপন-পথ ইনি জানিবেন, এতবড় আশা এ-ভদ্রলোক সম্বন্ধে আমি রাখি নাই। কারণ, দেশে ও কালে কদাচিৎ এ-জাতীয় সন্ধানী পথচারী আসিয়া থাকেন। আমি আশ্চর্য হইয়াছিলাম অন্য কারণে।

মহাপুরুষের প্রতি এর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এত অকৃত্রিম ছিল যে, সত্যই তা আশ্চর্য-কিছুর মত আসিয়া আমাদের লাগিয়াছিল।

তিনি এক সময়ে যখন প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— “আপনারা কি তবে বলতে চান যে, বুদ্ধ-যীশু এঁরা মানুষ ঠকাবার জন্য এসেছিলেন? কতগুলি মিথ্যা কথা দিয়ে যাবার জন্যে এত কষ্ট করলেন? তখন এঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমি থতমত খাইতে দেখিয়াছি।

ভদ্রলোক যুক্তিকে বিশ্বাস দিয়া ঠেকাইতেছেন, এ জানিয়াও আমার বন্ধুদের সে-দিন বিচলিত হইতে হইয়াছিল। এ-বিশ্বাসের জোর যে কত অমোঘ, সে-সন্দেহ আমাদের কাহারও ছিল না। এত জোরালো বিশ্বাস পাগলের থাকে না, কিম্বা থাকিলে হয়তো শুধু পাগলেরই থাকে।

নিজের জীবনে, অনেক বন্ধু-বান্ধবেরও, দেখিয়াছি যে, আমাদের বিশ্বাসের জোর কত কম। যুদ্ধে তাই পরাস্ত হই, কিম্বা মাঝপথে কাজ ও সংকল্প ছাড়িয়া দেই। নিজের চরিত্রে এ-ত্রুটি আছে, তাই ভদ্রলোকের কথা ভুলিতে পারি নাই। যখনই মনে পড়িয়াছে, তখনই একটি অকপট সরল-বিশ্বাসের ছবি দৃঢ় ভঙ্গিমায় চোখের সামনে খাড়া হইয়া উঠে দেখিয়াছি।

আজ সত্যই পরিষ্কার দেখিতে পাই—অসীম সমুদ্রে ঢেউয়ের মত মানুষ উঠিতেছে, আবার নামিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। সমস্তই জলে জলময়, শুধু একটি পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া জাগিয়া আছে। মৃত্যু-সমুদ্রের ঢেউ আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, তাকে জলে ডুবাইতে পারেনা, বিচলিত করিতে পারেনা কিম্বা ক্ষয়ও করিতে পারে না—মৃত্যু-জয়ী এ-বিশ্বাস। এ-বিশ্বাস অজানা সমুদ্রে আলোক-স্তম্ভের মত খাড়া হইয়া আছে—জীবন-পোতগুলির দিক-নির্ণয়ের সাহায্যের জন্য। এ যেন সৃষ্টির নিজের কাছে নিজেরই মাভৈঃ-আশ্বাস। বুদ্ধিতে নয়, প্রতিভাতে নয়, অদম্য-চেষ্টাতেও নয়—এই বিশ্বাসের জোরেই মানুষ অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে, ভবিষ্যতেও করিবে। মানুষের সমস্যাগুলির সমাধানের অন্যপথ নাই। বিশ্বাস হারাইলে মানুষের বুদ্ধি অন্ধ হইয়া যাইত, সৃষ্টির আলোই নিভিত।

কেবলই আজ মনে জিজ্ঞাসা আসিতেছে যে—আমাদের মধ্যে সে মানুষ কই, যার বিশ্বাসের সম্মুখে পাহাড় পর্যন্ত টলিয়া যাইবে এবং মানুষের মুক্তির রাস্তা উন্মুক্ত হইবে। মানুষকে সে-বিশ্বাস কি কেউ আবার ফিরাইয়া আনিয়া দিবে না?

কয়েক মাস আগে সেদিন এ-লেখা আরম্ভ করিবার সময় বলিয়াছিলাম—'বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।

কথাটা দুদিক দিয়া সত্য ছিল। জেলের বাহির দরজায় সেই যে ঢুকিবার সময় তালা পড়িয়াছে, এই এতদিন তাহা সমান ভাবেই আবদ্ধ আছে, শুধু নূতন আগন্তুকের ভিতর প্রবেশের পথ খোলা।

নিজের দিক দিয়াও কথাটা সত্য ছিল। কোন সম্মুখ বা বাহির মনের সামনে এতদিন ছিল না। একটা দিনকেই বছরের পর বছর আবৃত্তির মত যাপন করিয়া চলিয়াছি। তাই লোভ হইয়াছিল নিজের ভিতরে প্রবেশ করিবার। যাহা দেখিব তাহা বলিবার ভার কলমের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। নিজেকে এইভাবে নিজের জানাও হইবে, সান্নিধ্যও দেওয়া হইবে ভাবিয়াছিলাম।

কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া শুধু স্মৃতির জাবর কাটিয়াছি এই লেখায়। মনের সীমান্তশেষে নূতন দেশ আবিষ্কার করার কথা, নিজের সত্য-পরিচয় জানা এ-সব আর মনে রাখিতে পারি নাই।

কিন্তু এখন আর সে-সময় নাই। আজ ভিতর দুয়ারে কপাট পড়িল, বাহির দুয়ারে তালা খুলিবার শব্দ শুনিতেছি। আগামী-কাল জেল হইতে আমাকে বাহির করিয়া দিবে, চলন-বিলের ধারে কোন এক গ্রামে অন্তরীণ হইবার হুকুম নাকি আসিয়াছে। যে-মন কলম লইয়া আমার সাথে সাথে ছিল, এ-খবরে সে সরিয়া পড়িয়াছে, তার আর দেখা পাইতেছি না। ভিতর আমাকে ছাড়িয়া দিল, বাহিরের অধিকারে গিয়া পড়িবার প্রতীক্ষায় এখন আছি।

এবারকার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলির এতগুলি দিন জেলখানার হাতে রাখিয়া গেলাম। ছাড়িয়া যাইতে বড় মনে লাগে। এ-দিনগুলির উদ্ধার কি কোনমতেই সম্ভব নহে? "জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা"—এ-সান্ত্বনা সত্য না মিথ্যা?

বড় ভয় করিতেছে বাহিরে যাইতে। অপরিচিত পৃথিবী, জল ও ছায়ার আতিথ্যশূন্য মরুভূমির তপ্ত শুষ্ক ছবি কেবল চোখের সামনে দেখি কেন? এ কী নির্মম ও ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ আজ আমাকে সম্মুখে ডাকিতেছে? ভিতরটা আজ আমার বড়ই ভয়াতুর একদিকে।

অন্যদিকে দেখি, মনের নির্জন-গুহা হইতে কে বাহির হইয়া আসিল অশ্ব-সারথি। তারপর, ক্ষুরে ক্ষুরে তপ্ত বালু-ধূলি উড়িয়া চলিল। চলচ্চিত্রের ছায়া-ছবির মত অপরিচিত মরু পৃথিবী ও সম্মুখ-ভবিষ্যৎ কেবল পিছনে সরিয়া

মিলাইয়া যাইতেছে এক চোখের দৃষ্টির তল দিয়া। অশ্বারোহীর আর এক চোখে ধ্যান-দৃষ্টি—সমস্ত সম্মুখের সীমা পার হইয়া কোন অসীমের নীড়ে গিয়া নিবন্ধ রহিয়াছে?

* * * * *

অসমাপ্ত লেখা মাঝখানেই সমাপ্ত করিলাম। শরতের আকাশ আলোতে প্রসন্ন, আমার শেষ-কথা জানাইবার এই তো শুভ-সময়—

"আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম,
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।"